তত্ত্বীয় আলোচনা = ১৮
শ্রেণি কর্মকাণ্ড = ৭
মোট পিরিয়ড = ২৫

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থনৈতিক রসায়ন

Economic Chemistry

ভূমিকা (Introduction)

আমাদের বাংলাদেশ একটি জনবহুল; বর্তমানে প্রায় 16 কোটি জনসংখ্যার 147, 570 km^2 আয়তনের দেশ। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান চালিকাশক্তি হলো সে দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানা। বাংলাদেশে শিল্প কারখানার সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়; বিশেষ করে রাসায়নিক শিল্প কারখানা আরো অনেক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিল্পের প্রধান চালিকাশক্তি হলো দেশের খনিজ সম্পদ। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার কিছু খনিজ ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ সম্পদ নেই। আমাদের এ দু'প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে শিল্পোন্নয়নে ব্যবহার করতে হবে।

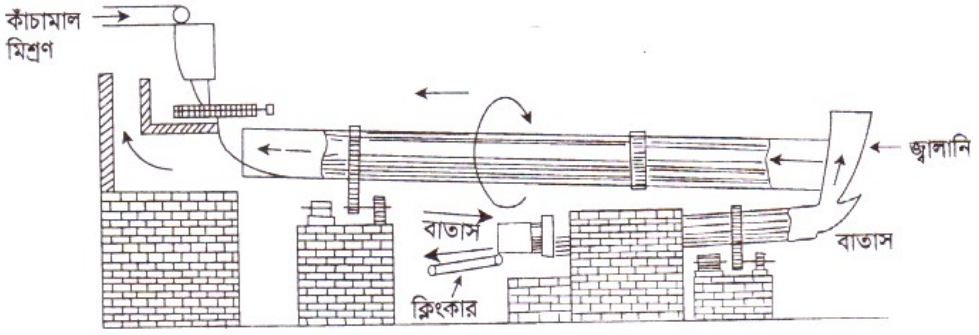

শিখন ফল : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র, গ্যাসের উপাদান ও ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে।
২. বাংলাদেশের কয়লা ক্ষেত্র, কয়লার মান ও ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে।
৩. জ্বালানি সম্পদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে শিল্পায়নের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৪. বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রসায়ন শিল্পের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবে।
৫. ইউরিয়া, কাচ, সিরামিক, পাল্প-পেপার ও সিমেন্ট উৎপাদনের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬. চামড়া টেনিং এর মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭. সিমেন্ট, ইউরিয়া, চামড়া, টেক্সটাইল ও ডায়িং শিল্পের দূষকসমূহের বর্ণনা করতে পারবে।
৮. বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের (প্রভাবকীয় রূপান্তর, দ্রবীভূতকরণ ও সূক্ষ্ম ছাঁকনি) মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৯. ইটিপি'র কার্যপ্রণালির মূলনীতি (তড়িৎ বিশ্লেষণ, প্রভাবন ও জীব প্রযুক্তি) ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০. আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, কপার, কাচ ও প্লাস্টিক রিসাইকেল প্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১১. সামাজিক ও পরিবেশ ক্ষেত্রে আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, কপার, কাচ, পেপার ও প্লাস্টিক রিসাইকেলের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
১২. ইট খোলার বায়ু দূষণ পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে পারবে।
১৩. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সুবিধা অসুবিধা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
১৪. ন্যানো পার্টিকেল ও ন্যানো প্রযুক্তির প্রাথমিক ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
১৫. পরমাণু, অণু ও ন্যানো পার্টিকেলের তুলনা করতে পারবে।
১৬. পদার্থের স্বাভাবিক অবস্থা ও ন্যানো কণার ভৌত ধর্মের তুলনা করতে পারবে।
১৭. শিল্পে ন্যানো পার্টিকেল ব্যবহারের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহ (Key words): প্রাকৃতিক গ্যাস, বিটুমিনাস কয়লা, বিটিইউ, গ্লেজিং, সেলুলোজ ফাইবার, লিগনিন, ক্লিংকার, কিউরিং, FGD-প্লান্ট, ETP, বিলেট, বায়োডিগ্রেডেবল, ন্যানো পার্টিকেল, ফুলারিনস, ন্যানো টিউব, সেমিকন্ডাক্টর।

MCQ. 5.1: বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় গ্যাসক্ষেত্র নিচের কোনটি? [সি.বো. ২০১৫]

(ক) তিতাস (খ) কৈলাসটিলা
(গ) বাখরাবাদ (ঘ) হবিগঞ্জ

৫.১.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র

Natural Gas Fields of Bangladesh

প্রাকৃতিক গ্যাস : ভূপৃষ্ঠ হতে বিভিন্ন গভীরতায় শিলাস্তরের মধ্যে সঞ্চিত পেট্রোলিয়াম খনিজ তেলের ওপরিভাগে অথবা পৃথকভাবে ভূগর্ভে অতি উচ্চচাপে সঞ্চিত বিভিন্ন গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনের যে মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাকে প্রাকৃতিক গ্যাস (**natural gas**) বলে।

গ্যাস ক্ষেত্রের অবস্থান : বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল যেমন- বৃহত্তর সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া দেশের সমুদ্রসীমায় কিছু গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। **আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র হলো মোট ২৬টি।** তবে এসব প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রে মজুদ গ্যাসের পরিমাণ নিশ্চিত করা যায়নি। চিত্র – ৫.১ এ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রের অবস্থান এবং সারণি ৫.১- এ বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাসের সম্ভাব্য মোট পরিমাণ, উত্তোলনযোগ্য পরিমাণ এবং 2011 সাল পর্যন্ত উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ও অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ বিলিয়ন **কিউবিক ফিট, BCF এককে দেখানো আছে।** [$1 BCF = 10 \times 10^9$ C.F]। তবে এরপর প্রায় প্রতি বছর কোনো না কোনো নতুন গ্যাসক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছে। ফলে উত্তোলনযোগ্য রিজার্ভ গ্যাসের পরিমাণ এবং গ্যাস উত্তোলনের পরিমাণ প্রতি বছর বাড়ছে। গ্যাস উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশকে মোট **23টি ব্লকে** বিভক্ত করা হয়েছে।

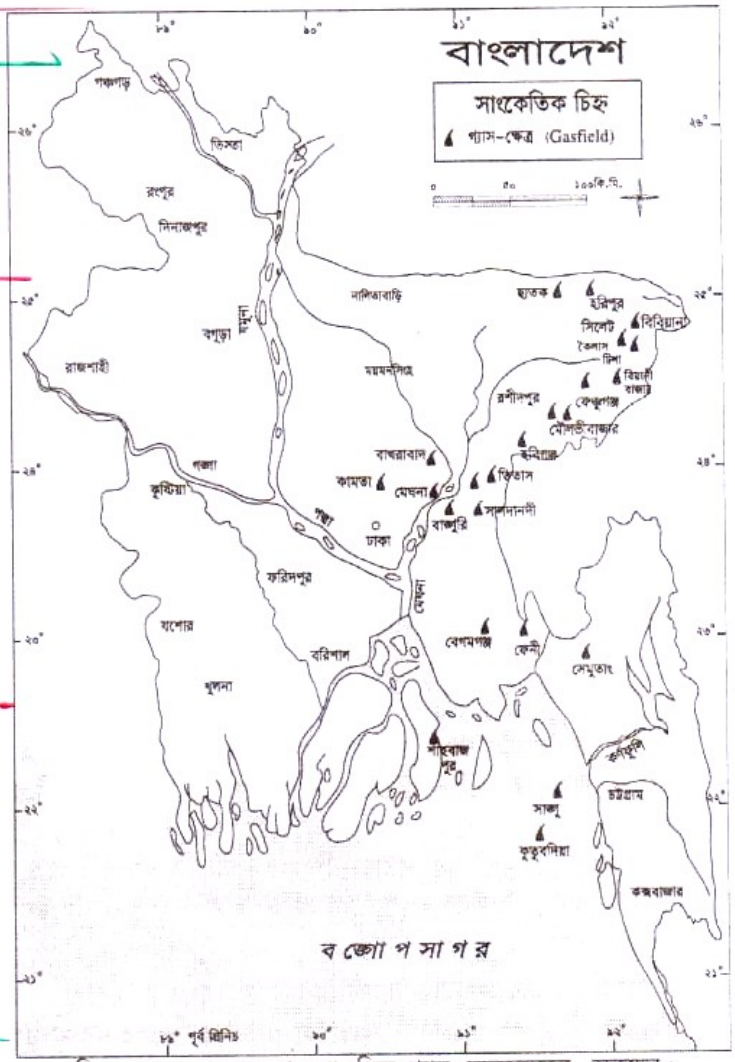

চিত্র ৫.১ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের অবস্থান।

৫.১.২ প্রাকৃতিক গ্যাসের উপাদান ও ব্যবহার

Composition and Uses of Natural Gas

প্রাকৃতিক গ্যাসের উপাদান : প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদান হচ্ছে বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন। C_1 হতে C_4 পর্যন্ত হাইড্রোকার্বনসমূহ কক্ষতাপমাত্রায় গ্যাসীয়। সুতরাং প্রাকৃতিক গ্যাসে এ সব হাইড্রোকার্বন থাকে। এছাড়া উচ্চতর কিছু হাইড্রোকার্বনের বাষ্প এতে থাকে। পৃথিবীর কোনো কোনো গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাসে **হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)** গ্যাস **থাকে। এটি খুবই দুর্গন্ধযুক্ত এবং এর উপস্থিতি প্রাকৃতিক গ্যাসের মান নিম্নমুখী** করে। কোনো প্রাকৃতিক গ্যাসে H_2S এর পরিমাণ $5.7 mg/m^3$ এর চেয়ে কম থাকলে তাকে **sweet** গ্যাস এবং এর বেশি থাকলে তাকে **sour** গ্যাস বলা হয়।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসে প্রায় শতকরা (আয়তনে) 93.68 – 98% মিথেন থাকে; এবং এতে হাইড্রোজেন সালফাইড প্রায় অনুপস্থিত। সুতরাং বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত উচ্চমানের।

প্রাকৃতিক গ্যাসের শ্রেণিবিভাগ : প্রাকৃতিক গ্যাসে তরল হাইড্রোকার্বন বা উচ্চতর হাইড্রোকার্বনের (C_5-C_{16}) বাষ্পের উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে প্রাকৃতিক গ্যাস দুই প্রকার। যেমন, (i) শুষ্ক প্রাকৃতিক গ্যাস ও (ii) আর্দ্র প্রাকৃতিক গ্যাস

শুষ্ক প্রাকৃতিক গ্যাস : শুষ্ক প্রাকৃতিক গ্যাসের নলকূপে তরল পেট্রোলিয়াম থাকে না। এতে সবচেয়ে বেশি মিথেন গ্যাস থাকে। সিলেটের রশীদপুরের প্রাকৃতিক গ্যাসে 98% CH_4 আছে।

আর্দ্র প্রাকৃতিক গ্যাস : আর্দ্র প্রাকৃতিক গ্যাসের নলকূপে তরল পেট্রোলিয়াম থাকে। তাই আর্দ্র প্রাকৃতিক গ্যাসে তরল উচ্চতর হাইড্রোকার্বন যেমন পেন্টেন, হেক্সেন, হেপ্টেন ইত্যাদির বাষ্প মিথেনের সাথে থাকে।

উপাদান গ্যাস	শুষ্ক গ্যাস%	আর্দ্র গ্যাস%
(১) মিথেন (CH_4)	93– 99%	84–85%
(২) ইথেন (C_2H_6)	0.1-4.0%	5–20
(৩) প্রোপেন (C_3H_8)	0.1–1.0%	1–50
(৪) বিউটেন (C_4H_{10})	0.1–1.23%	1–2.6
(৫) পেন্টেন (C_5H_{12})	–	0.4
(৬) হেক্সেন (C_6H_{14})	–	0.4
(৭) হেপ্টেন (C_7H_{16})	–	0.1
(৮) N_2 গ্যাস	0.02–0.99%	সামান্য
(৯) CO_2 গ্যাস	0.05–0.90%	সামান্য
(১০) H_2S গ্যাস	–	0.08–0.13

জেনে নাও : বাংলাদেশে	
(১) গ্যাস ক্ষেত্র	: 26 টি
(২) সক্রিয় নলকূপ	: 92 টি
(৩) ব্লক সংখ্যা	: 23 টি
(৪) দৈনিক উত্তোলন	: 2728 MCF
(৫) মজুদ গ্যাস	: 14,088 TCF
(৬) সরবরাহ কেন্দ্র	: 49 টি
(৭) চাহিদা পূরণ	: 31%
(৮) সর্বাধিক CH_4 (রশীদপুর)	: 98%
(৯) H_2S গ্যাস	: প্রায় অনুপস্থিত

প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার : প্রাকৃতিক গ্যাস হাইড্রোকার্বন হওয়ায় একে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে রাসায়নিক শিল্পে অনেক জৈব যৌগ উৎপাদন করা যায়। উন্নত দেশসমূহে পেট্রো-কেমিক্যালস একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত, যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল (যা উচ্চতর হাইড্রোকার্বন) হতে অনেক যৌগ উৎপাদন করা হয়। তবে বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো শিল্প এখনো গড়ে ওঠেনি।

★ (১) শিল্পক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইউরিয়া সার তৈরিতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামে CUFL ও KAFCO-তে এবং সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে স্থাপিত **মোট ৭টি কারখানায় প্রাকৃতিক গ্যাস হতে ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়।**

বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে এ ইউরিয়া ব্যবহার অধিক ফসল উৎপাদনে প্রচুর সাফল্য এনে দিয়েছে।

২০১৫ সালের জানুয়ারিতে ১৩.৬০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ আছে। [সারণি ৫.১]

★ (২) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী প্রতিদিন 2733.6 মিলিয়ন ঘনফুট (MCF) গ্যাস উত্তোলন এবং ৪৯টি স্থান থেকে এ প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের গ্যাস চাহিদার 31% পূরণ করছে তিতাস গ্যাস ফিল্ড।

★ (৩) বর্তমানে প্রতিদিন 1249.1 BBL(barrel) তরল কনডেন্সেট (condensate) করা হচ্ছে। এ কনডেন্সেটকে পরিশোধন করে পেট্রোল, কেরোসিন, ফার্নেস অয়েল, লুব্রিকেন্ট অয়েল ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে এসব জ্বালানিরূপে ও মেসিনের লুব্রিকেন্টরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। 1 BBL(barrel) = 159 L = 42 US gallons; 1 cubic metre = 6.2898 oil barrels.

সারণি –৫.১ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রসমূহের অবস্থান ও উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ

[পেট্রোবাংলার ডিসেম্বর ২০১৫ সালের বার্ষিক রিপোর্ট, বিলিয়ন কিউবিক ফিট (BCF) এককে।]

অপারেটর কোম্পানি	গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার সন (ক) গ্রুপ	কূপ সংখ্যা (কার্যকর)	প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি MMSCF	উত্তোলনযোগ্য গ্যাস BCF	বর্তমান প্রোডাকশন		উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট গ্যাস BCF জানুয়ারি, ২০১৬
					গ্যাস MMSCF	কনডেন্সেট BBL (ব্যারেল)	
BGFCL (1)	১. তিতাস (1962)	23 (21)	518	6367.0	516.5	367.0	2326.61
	২. বাখরাবাদ ('69)	9 (6)	43	1231.5	39.6	18.0	442.58
	৩. হবিগঞ্জ ('63)	11 (7)	225	2633.0	225.1	11.4	442.06
	৪. নরসিংদী ('90)	2 (2)	30	276.8	28.0	49.2	106.25
	৫. মেঘনা ('90)	1 (1)	11	69.9	11.1	20.1	11.00
	Sub Total (1)	46 (37)	827	10.578.2	820.3	465.7	3328.50
SGFCL (2)	৬. সিলেট (1955)	3(2)	8	318.9	8.3	61.1	110.57
	৭. কৈলাসটিলা ('62)	6(5)	73	2760.0	70.5	581.8	2137.21
	৮. রশীদপুর ('60)	8(5)	60	2433.0	58.1	50.7	1868.16
	৯. বিয়ানীবাজার (81)	2(1)	9	2030	9.6	150.4	111.80
	Sub Total (2)	19 (13)	150	5714.9	146.5	844.1	4227.74
BAPEX (3)	১০.সালদা নদী (1996)	3 (1)	10	279.0	8.3	1.0	194.81
	১১. ফেঞ্চুগঞ্জ ('88)	5 (3)	35	381.0	35.6	25.5	242.81
	১২. শাহবাজপুর ('95)	4 (2)	50	390.0	38.5	3.0	371.19
	১৩. সেমুতাং ('69)	6 (2)	3	317.7	3.4	0.9	306.63
	১৪. সুন্দলপুর (2011)	1 (1)	3	35.1	4.0	0.0	25.67
	১৫. শ্রীকাইল (2012)	3 (2)	40	161.0	36.0	25.5	121.50
	১৬. বেগমগঞ্জ (1977)	3 (1)	2	70.0	1.2	0.0	69.21
	SubTotal (3)	25 (12)	143	1633.8	126.9	55.9	1331.82
IOCs: (International Oil Companies)							
CHEV-RON (4)	১৭.জালালাবাদ (1989)	6 (6)	260	1184.0	268.7	1577.1	188.96
	১৮.মৌলভীবাজার ('97)	9 (5)	50	428.0	47.5	3.3	145.59
	১৯. বিবিয়ানা ('98)	24(24)	1200	5754.0	1219.0	9234.0	3484.63
Tullow (5)	২০. বাঙ্গুরা (2004)	6(4)	110	522.0	104.6	310.0	198.59
	SubTotal (4)	45 (39)	1620	7888.0	1639.9	11124.4	4017.77
	Grand Total (ক): (1 + 2 + 3 + 4)	135(101)	2,740	25814.9	2,733.6	12,490.1	12905.83

খ-গ্রুপ : গ্যাস উত্তোলন অপেক্ষমাণ (Non-Producing)

CAIRN BAPEX	২১। কুতুবদিয়া ('77) ২২। রূপগঞ্জ (2014)	–	–	45.5 33.6	–	–	45.5 33.6
	SubTotal (খ):			79.1			79.10

গ-গ্রুপ : গ্যাস উত্তোলন বন্ধ (Production Suspended) :

CAIRN	২৩। ছাতক* (1959)	–	–	474.0	–	–	447.54
BAPEX	২৪। কামতা (1981)	–	–	50.3	–	–	29.20
BAPEX	২৫। ফেনী (1981)	–	–	125.0	–	–	62.60
CAIRN	২৬। সাঙ্গু** (1996)	7 (7)	9	577.8	–	–	79.57
Grand Total (ক + খ + গ) in BCF :				27121.1			13603.84
Grand Total (ক + খ + গ) in TCF :				27.12			13.60

দ্রষ্টব্য : * ছাতক গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাস সঞ্চয় পুনর্মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

** সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাস উত্তোলন ১লা অক্টোবর, ২০১৩ থেকে বন্ধ আছে।

* BGFCL = Bangladesh Gas Field Corporation Ltd.

* SGFCL = Sangu Gas Field Corporation Ltd.

* BAPEX = Bangladesh Petroleum Exploration

সারণি–৫.২ : প্রাকৃতিক গ্যাসের রাসায়নিক সংযুক্তি (শতকরা আয়তনে)

উপাদানসমূহ	শতকরা পরিমাণ	সর্বনিম্ন পরিমাণে, গ্যাসক্ষেত্র	সর্বোচ্চ পরিমাণে, গ্যাসক্ষেত্র
১। মিথেন	93.68–98%	93.68%; বিয়ানীবাজার শাহবাজপুর	98%; রশীদপুর
২। ইথেন	1.21–3.95%	1.21%; রশীদপুর	3.95%; শাহবাজপুর
৩। প্রোপেন	0.05–0.94%	0.05%; হরিপুর (সিলেট)	0.94%; কৈলাসটিলা
৪। iso-বিউটেন	0.08–0.29%	0.08%; তিতাস	0.29%; বিয়ানীবাজার
৫। n-বিউটেন	0.01–1.23%	0.01% হরিপুর (সিলেট)	1.23% বিয়ানীবাজার
৬। N_2 গ্যাস	0.02–0.99%	0.02%; রশীদপুর	0.99%; বিয়ানীবাজার
৭। CO_2 গ্যাস	0.05–0.90%	0.05% রশীদপুর	0.90%; শাহবাজপুর

(২) ইউরিয়া সার উৎপাদনের পর বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার হচ্ছে জ্বালানি হিসেবে। প্রথমদিকে গৃহস্থালীতে এ গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এছাড়া বর্তমানে প্রায় সব মটর গাড়ি, বেবিট্যাক্সিতে প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে বেবিট্যাক্সিগুলো জ্বালানি হিসেবে CNG (Compressed Natural Gas) ব্যবহার করে বলে এদের চলতি নাম CNG হয়ে আছে।

(৩) বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। অধিকাংশ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাসকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে তাপ উৎপাদন করা হয়, সে তাপশক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

দেশের গ্যাস-ক্ষেত্রসমূহ থেকে উত্তোলিত মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় অর্ধেক-এর বেশি (55%) **ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে,** অবশিষ্টের তৃতীয়াংশের বেশি সার উৎপাদনে এবং বাকি অংশ বাসা-বাড়িতে, শিল্পে ও গাড়িতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পেট্রোবাংলার (২০১০-২০১১) বার্ষিক রিপোর্ট মতে নিম্নোক্ত খাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ জানা যায় :

১। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত গ্যাসের মোট পরিমাণ = 55%
[সরকারি + বিভিন্ন বেসরকারি প্রকল্পে = 39% + 16%]
২। শিল্পক্ষেত্রে, চা বাগানে (17 + 1)% = 18%
৩। ইউরিয়া সার (fertilizer) উৎপাদনে = 10%
৪। বাসা-বাড়িতে (domestic) জ্বালানিরূপে = 12%
৫। গাড়ির জ্বালানিরূপে (CNG) = 5%

শিল্প কারখানায়, গৃহস্থালীতে জ্বালানিরূপে ও মোটরযানে CNG রূপে ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার প্রতি বছর বেড়ে চলেছে। তাই প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা পূরণ করতে বিদেশ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির প্রচেষ্টা চলছে।

পাশের চিত্র-৫.২ : কলাম গ্রাফ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের বাৎসরিক ব্যবহারের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে।

MCQ–5.2 : বাংলাদেশের কোন গ্যাস ক্ষেত্রের প্রাকৃতিক গ্যাসের রাসায়নিক সংযুক্তিতে সবচেয়ে বেশি মিথেন ও সবচেয়ে কম CO_2 গ্যাস আছে?
(ক) তিতাস, (খ) হরিপুর
(গ) রশীদপুর, (ঘ) বিয়ানীবাজার

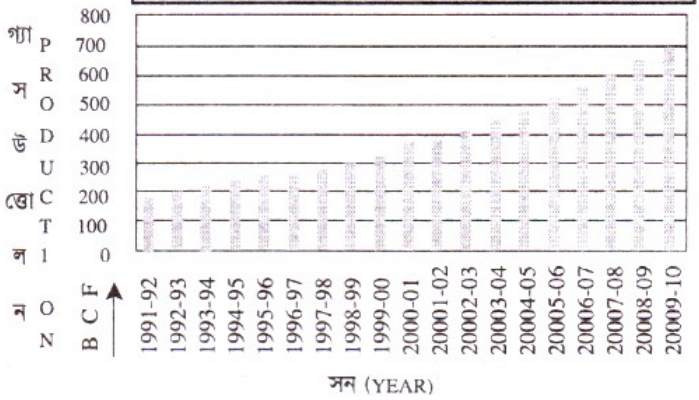

চিত্র ৫.২ : কলাম গ্রাফ আকারে বাৎসরিক গ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহারচিত্র

গ্যাস তেল পরিমাপের একক
(রোমান সংখ্যা)

M	$= 10^3$
MM	$= 10^6$ (in gas)
MMbl	= Million barrels
MMBtu	= Million British Thermal Unit
Mcf	= Thousand cubic feet
MMcf	= Million cubic feet
MMcm	= Million cubic metres

MMscf	= Million standard cubic feet. [temp = 60°F (15.6°C, 1atm)]
MMscm	= Million standard cubic metres
Bcf	= Billion cubic feet $(B = 10^9)$
Tcf	= Trillion cubic feet $(T = 10^{12})$
Bcf	= 30× MMcm
Mtoe	= Million tones oil equivalent
Mtpa	= Million tones per annum

শিক্ষার্থীর কাজ : প্রশ্ন-৫.১ : বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫.২.১ বাংলাদেশের কয়লা ক্ষেত্র (Coal Fields of Bangladesh)

কয়লা (Coal) : প্রাকৃতিক কারণে গাছপালা ভূগর্ভে মাটির নিচে চাপা পড়ে। সুদীর্ঘকাল যাবৎ অধিক চাপ ও তাপের প্রভাবে ঐ চাপাপড়া গাছপালার মধ্যে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। তখন স্তরীভূত ও কঠিন পদার্থরূপে পরিণত ঐ দহনযোগ্য জীবাশ্মকে কয়লা বলে। ভূগর্ভে চাপাপড়া উদ্ভিদের কয়লায় রূপান্তরের প্রাথমিক রূপ হলো **পিট কয়লা**। এরপর ধারাবাহিক রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে লিগনাইট কয়লা, বিটুমিনাস কয়লা ও শেষে উন্নত অ্যানথ্রাসাইট কয়লায় পরিণত হয়।

পিট কয়লা $\xrightarrow[\text{ও তাপ } (\Delta)]{\text{চাপ}}$ লিগনাইট কয়লা (বাদামি কয়লা) $\xrightarrow[\Delta, \Delta]{\text{চাপ}}$ বিটুমিনাস কয়লা (কালো নরম কয়লা) $\xrightarrow[\Delta, \Delta, \Delta]{\text{চাপ}}$ অ্যানথ্রাসাইট কয়লা শক্ত কয়লা

বাংলাদেশের কয়লা ক্ষেত্র : বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ হলো কয়লা। অনেক দেশে কয়লাকে black diamond বলা হয়। বাংলাদেশের রাজশাহীর বগুড়া জেলার জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, দিনাজপুরের **বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি ও দীঘিপাড়া এবং** রংপুর জেলার **খালিসপুর** ইত্যাদি পাঁচটি খনিতে উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা আছে। এ পাঁচটি কয়লার খনিতে **মোট কয়লার মজুদের পরিমাণ হলো 3.697 বিলিয়ন মেট্রিক টন**। এ পরিমাণ কয়লা 27.7 গিগা মিটার কিউব (Gm^3) CH_4 গ্যাসের সমতুল্য।

সর্বশেষ 1997 সালে ফুলবাড়ি কয়লা আবিষ্কৃত হলেও এ খনি থেকে কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি নিয়ে নানা প্রশ্নের মুখে এতদিন এ খনি থেকে কয়লা উত্তোলন বন্ধ ছিল। উন্মুক্ত কয়লা উত্তোলন পদ্ধতিতে এ কয়লা উত্তোলন করা হলে- (১) এলাকার ১৪,৬৬০ একর কৃষি জমি নষ্ট হবে; (২) প্রায় ২ লক্ষ অধিবাসীকে ঐ এলাকা থেকে অন্য স্থানে নিতে হবে। (৩) এছাড়া পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া সর্বপ্রথম 1965 সালে আবিষ্কৃত জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ কয়লার খনিতে সবচেয়ে পুরাতন সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ রয়েছে 1050 মেট্রিক টন। সিলেট জেলায় উন্নতমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার খনি আছে; (চিত্র-৫.৩)।

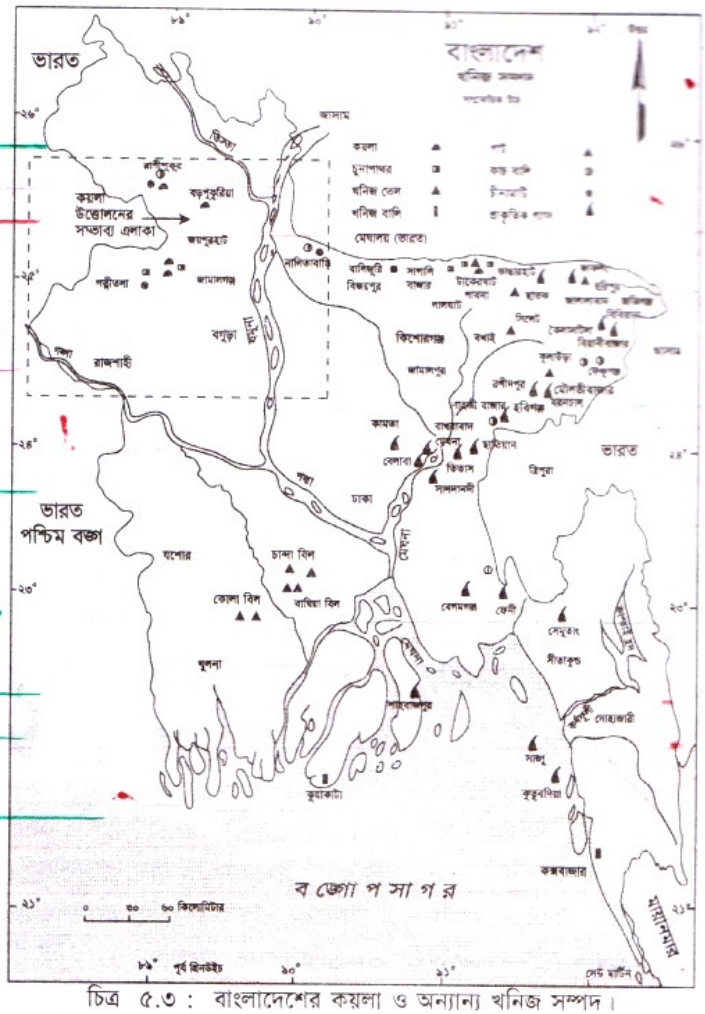

চিত্র ৫.৩ : বাংলাদেশের কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ।

ফরিদপুরে বাঘিয়া ও চান্দাবিল, খুলনার কোলা বিল ও সিলেটে পীট (peat) জাতীয় নিম্নমানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশে আবিষ্কৃত বিভিন্ন কয়লার খনিতে কয়লা স্তরের অবস্থান, খনিতে বিদ্যমান কয়লার পরিমাণ লক্ষ টন এককে সারণি-৫.৩-দেখানো হলো। এখন বড় পুকুরিয়া কয়লার খনি থেকে **প্রতিদিন প্রায় 650 টন কয়লা উত্তোলন করা হয়**।

সারণি - ৫.৩ : বিভিন্ন কয়লা খনির অবস্থান, মজুদ কয়লার ও মিথেন গ্যাসের পরিমাণ

কয়লা খনির অবস্থান, (সন)	ভূপৃষ্ঠ হতে খনির গভীরতা (মিটার)	খনিতে মোট কয়লার পরিমাণ মিলিয়ন মে.টন	কয়লাভিত্তিক মিথেন (CBM) গড় পরিমাণ, 9.56 m^3/ton Gm^3 এককে
১. জামালগঞ্জ, (1965) জয়পুরহাট, বগুড়া :	640– 1158	1050	10.04
২. বড়পুকুরিয়া, (1996) দিনাজপুর।	129 – 509	390	3.73
৩. ফুলবাড়ি (1997), দিনাজপুর :	150–250	572	5.47
৪. খালিসপুর (1995), রংপুর :	257 – 483	685	6.55
৫. দীঘি পাড়া, (1995) দিনাজপুর :	328 – 407	*200 (Partly)	1.91
সর্বমোট :		3,697 মে.টন	27.70 Gm^3

৫.২.২ বাংলাদেশের কয়লার মান ও ব্যবহার
Quality and Uses of Bangladeshi Coal

বৈশিষ্ট্যভিত্তিক কয়লার শ্রেণিবিভাগ :

১। পিট কয়লা (Peat) : ভূগর্ভে চাপাপড়া উদ্ভিদের কয়লায় রূপান্তরের প্রাথমিক স্তর হলো পিট কয়লা। এতে 80 – 90% পানি থাকে। এটির জ্বালানি মান (fuel value) সবচেয়ে কম এবং তা প্রতি পাউন্ড দহনে 10,000 BTU তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়। কয়লার জ্বালানি মানকে **ক্যালরিফিক মান** (calorific value) বলে। এ ক্যালরিফিক মান BTU এককে প্রকাশ করা হয়।

*** কয়লার জ্বালানি মান বা ক্যালরিফিক মান :** এক পাউন্ড কয়লাকে পোড়ালে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তাকে সে কয়লার তাপ উৎপাদন ক্ষমতা বা জ্বালানি মান বলে। কয়লার জ্বালানি মানকে BTU তাপ এককে প্রকাশ করা হয়। যেমন বড় পুকুরিয়া কয়লার ক্যালরিফিক মান হলো 11040 BTU/lb। Dental 15–17

রেলওয়ে লোকোমোটিভ ও বয়লারের জ্বালানিরূপে পিট কয়লা ব্যবহার করা হয়।

*** ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট (BTU) :** এক পাউন্ড পানির (453.59 g) তাপমাত্রা 1° ফারেনহাইট (1°F) বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপ-শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে এক ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট (IBTU) বলে।

ক্যালরিফিক মান (IBTU) = 1055 J = 252.145 (calorie) Dental 16–17

২। লিগনাইট কয়লা (Lignite) : লিগনাইট কয়লা হলো পিট কয়লা ও বিটুমিনাস কয়লার মাঝামাঝি গুণ সম্পন্ন। এটির মধ্যে পানির পরিমাণ বা আর্দ্রতা 40% হয়। বাদামি বর্ণের লিগনাইট কয়লার জ্বালানি মান 10500 – 12000 BTU। লিগনাইট কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে, বয়লারের জ্বালানিরূপে ও প্রডিউসার গ্যাস ($2CO + N_2$) উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

$$2C(s) + (O_2 + N_2)(g) \xrightarrow{\Delta} 2CO(g) + N_2(g)$$

(৩) বিটুমিনাস কয়লা (Bituminous) : বিটুমিনাস কয়লা কালো, নরম ও শক্ত হতে পারে। বিটুমিনাস কয়লার তিনটি শ্রেণি রয়েছে। যেমন, সাববিটুমিনাস, বিটুমিনাস ও সুপার বিটুমিনাস। এদের মধ্যে আর্দ্রতার শতকরা হার ক্রমান্বয়ে কমে এবং এদের মধ্যে ফিক্সড কার্বনের শতকরা পরিমাণ ও ক্যালরিফিক মান ক্রমে বাড়ে। এদের শ্রেণিভেদে আর্দ্রতা 2.2 –15.9% হয়ে থাকে এবং ফিক্সড কার্বনের পরিমাণ 44– 78% থাকে। জ্বালানি মান 11000– 15000 BTU হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিটুমিনাস কয়লা ব্যবহৃত হয়।

(৪) অ্যানথ্রাসাইট কয়লা (Anthracite) : অ্যানথ্রাসাইট হলো সবচেয়ে উন্নত মানের শক্ত কালো বর্ণের কয়লা। এতে ফিক্সড কার্বনের পরিমাণ 86 – 88% থাকে, জ্বালানি মান 14500– 15500 BTU। এটির দহনে ছাই কম হয়। অ্যানথ্রাসাইট কয়লায় সালফার কম থাকে। ধোঁয়াবিহীন জ্বালানিরূপে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও ধাতু নিষ্কাশনে এটি ব্যবহৃত হয়।

(ক) কয়লার মান : কয়লার মান বলতে এতে উপস্থিত জলীয়বাষ্প, উদ্বায়ীবস্তু, কার্বনগুঁড়া, সালফারের উপস্থিতি, দহনের তাপ-মান ও দহনের পর সৃষ্ট ছাইয়ের পরিমাণ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণির হতে পারে। বিটুমিনাস কয়লা ও অ্যানথ্রাসাইট উন্নতমানের কয়লা। সারণি–৫.৪-এ উল্লেখিত বাংলাদেশের পাঁচটি কয়লা-খনির সব কয়লা বিটুমিনাস শ্রেণিভুক্ত উন্নতমানের কয়লা।

[2010 সালের জানুয়ারি 9–10, এ দু দিন ঢাকায় অনুষ্ঠিত Industrial Engineering and Operations Management ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত UAE এর Sharjah University এর Professors Mr. Shamsuzzaman ও F. Dweiri এবং জাপানের Hokkaido, Kitani Institute of Technology এর Mr Sharifullah–এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বাংলাদেশের কয়লার মান **নিম্নোক্ত ছয়টি বৈশিষ্ট্যসূচক বা Crieteria ভিত্তিক পাঁচটি কয়লা খনির মধ্যে চারটির কয়লার মান নিরূপণ করেন।]**

কয়লার মান নির্ধারক সূচকগুলো হলো– (১) কয়লার ক্যালরিফিক মান (BTU), (২) শতকরা সালফার, (৩) শতকরা কার্বন, (৪) শতকরা উদ্বায়ী বস্তু, (৫) শতকরা জলীয় বাষ্প ও (৬) ছাই (ash) এর উপস্থিতির শতকরা পরিমাণ। এক্ষেত্রে ক্যালরিফিক মান ও ফিক্সড কার্বনের পরিমাণ Heating value এর জন্য অধিক বিবেচ্য।

সারণি – ৫.৪ - এ কয়লার মান নির্ধারক সূচক মান দেয়া হলো।

সূচক → কয়লার খনি ↓	ক্যালরিফিক মান BTU/Ib	সালফার % পরিমাণ	যুক্ত (fixed) % কার্বন	উদ্বায়ী বস্তু (%)	জলীয় বাষ্প % পরিমাণ	ছাই (Ash) % পরিমাণ	সব সূচক মিলে গড়মান *
১. বড় পুকুরিয়া A_1	11040	0.52	48.40	29.20	10.00	12.40	0.214
২. দীঘিপাড়া A_2	12116	0.67	54.66	29.24	2.42	13.90	0.413
৩. খালিসপুর A_3	11264	0.77	54.10	22.86	1.28	21.80	0.257
৪. জামালগঞ্জ A_4	11878	0.55	36.72	36.92	3.58	24.25	0.338

সুতরাং বাংলাদেশের পাঁচটি খনির কয়লার মান খুবই উন্নত এবং কয়লাগুলো হলো বিটুমিনাস কয়লা। তবে দীঘিপাড়া খনির কয়লার মান সবচেয়ে বেশি। চারটি খনির কয়লার মান হলো $A_2 > A_4 > A_3 > A_1$

(খ) কয়লার মান বিশ্লেষণ : (১) কয়লার মূল জ্বালানি উপাদান হলো কার্বন। কয়লাতে শতকরা হারে যতবেশি কার্বন থাকে, সে কয়লা জ্বালানি হিসেবে ততো বেশি উন্নত মান যুক্ত হয়। (২) অপরদিকে সালফার দহনকালে বায়ুদূষক SO_2 গ্যাস উৎপন্ন করে; তাই সালফারের পরিমাণ কয়লাতে কম হলে ভালো। উদ্বায়ী বস্তু কম হলে কয়লার মান উন্নত ধরা হয়। (৩) কয়লার মধ্যে অজৈব ধাতব যৌগ ও বালি থাকে; এসব বস্তু কয়লার দহনের পর ছাই সৃষ্টি করে। ছাইয়ের পরিমাণ কম হলে কয়লার মান উন্নত হয়। (৪) কয়লার ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হলো তাপশক্তি উৎপাদন। যে কয়লার দহনে যতবেশি তাপ উৎপন্ন হয়, সে কয়লা ততো ভালো।

কয়লার ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট (BTU) : এক পাউন্ড কয়লা পোড়ালে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তাকে সে কয়লার তাপ উৎপাদন ক্ষমতা ধরা হয়। এটি ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট BTU (British Thermal Unit) এককে প্রকাশ করা হয়। বড়পুকুরিয়া কয়লার ক্যালরিফিক মান (Calorific Value) হলো 11040 Btu/lb অথবা 25.68 MJ/kg.

বাংলাদেশের বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে উত্তোলিত কয়লার 65% ব্যবহৃত হবে 250 MW বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এবং অবশিষ্ট 35% কয়লা অন্যান্য জ্বালানি খাতে ব্যবহৃত হবে। এ সব খাত হলো রেল ইঞ্জিনে, ইটের ভাটায়, বাড়ির ও দোকানের রান্নার কাজে ও কয়লাভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পের চুল্লির জ্বালানিরূপে।

[তথ্য উৎস : পেট্রোবাংলা, বার্ষিক রিপোর্ট, 2007-2008 BC MCL]

কয়লা বিশেষজ্ঞ : [প্রফেসর Md. Khalequzzaman Ph. D. Deptt. Geology and Physics, Lock Haven University, USA.] এর মতে,

(১) বাংলাদেশের বর্তমানে আবিষ্কৃত কয়লা খনিতে মজুদ কয়লার পরিমাণ আগামী 50 বছরের জন্য পর্যাপ্ত নয়।

(২) বাংলাদেশের জনসংখ্যার চাহিদা অনুসারে Fuel energy বা জ্বালানি শক্তির পরিমাণ অপ্রতুল। জ্বালানি ব্যবহারে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সমতুল্য হারে বাংলাদেশের 18000 MW (মেগাওয়াট) প্রতিদিনের চাহিদা আছে এবং এ চাহিদা ২০২০ সালের মধ্যে বেড়ে 25000 MW হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে দৈনিক কয়লা উত্তোলিত হয় 800 Mt (মেগাটন) এবং কয়লাভিত্তিক প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এ পরিমাণে উত্তোলিত কয়লা আগামী 10–15 বছরের জন্য যথেষ্ট।

শিক্ষার্থীর কাজ :

প্রশ্ন-৫.২ : বাংলাদেশের কয়লার মানভিত্তিক এ কয়লা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, তা মূল্যায়ন কর।

MCQ-5.3 : বাংলাদেশের কোন্ কয়লাখনির কয়লার ক্যালরিফিক মান 12116 BTU/lb?

(ক) বড় পুকুরিয়া (খ) দীঘিপাড়া (গ) খালিসপুর (ঘ) জামালগঞ্জ

কয়লার ব্যবহার : কয়লার ব্যবহারসমূহকে মূলত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন –

(ক) তাপ-শক্তির উৎসরূপে ও (খ) রাসায়নিক শিল্পে বিজারকরূপে এবং অ্যারোমেটিক যৌগ উৎপাদনে।

(ক) তাপশক্তির উৎসরূপে কয়লার ব্যবহার : তাপশক্তির উৎসরূপে কয়লাকে কঠিন অবস্থায়, তরল জ্বালানি ও গ্যাসীয় জ্বালানিতে রূপান্তর করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যেমন,

* Fuzzy Set Theory ভিত্তিক Ranking Score করে বিশেষজ্ঞরা সব সূচকের গড় মান নির্ণয় করেছেন। এটি একটি জটিল পদ্ধতি।

(১) কঠিন জ্বালানিরূপে কয়লা : শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন চুল্লিতে, ইট ভাটায়, তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনে, রেলগাড়ির স্টিম ইঞ্জিনে, হোটেল রেস্তোরা ও বাসগৃহের চুল্লিতে কঠিন জ্বালানিরূপে কয়লা ব্যবহৃত হয়। শিল্পক্ষেত্রে তাপ শক্তি উৎপাদনের জন্য মূলত বিটুমিনাস কয়লাকে অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়। অপরদিকে বাসগৃহ জ্বালানিরূপে অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা ব্যবহার করা হয়।

(২) বিটুমিনাস কয়লা থেকে গ্যাসীয় জ্বালানি : বিটুমিনাস কয়লাকে 900°–1400°C তাপমাত্রায় স্টিম বা বায়ু সহ উত্তপ্ত করে কয়লা থেকে বিভিন্ন জ্বালানি গ্যাস উৎপাদন করা হয়, এ প্রক্রিয়াকে **কয়লার গ্যাসীয়করণ** বলে। বিটুমিনাস কয়লা থেকে উৎপন্ন গ্যাসীয় জ্বালানি হলো–(i) কোল গ্যাস (ii) ওয়াটার গ্যাস, (iii) মিথেন গ্যাস, (iv) সংশ্লেষ গ্যাস, ও (v) প্রোডিউসার গ্যাস।

(i) কোল গ্যাস (coal gas) : বকযন্ত্র বা রিটর্টে (retort-এ) বিটুমিনাস কয়লার (10–12% পানি থাকে) অন্তর্ধূম পাতন (1000°–1300°C-এ) প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন সব উদ্বায়ী পদার্থকে ঘনীভূত করে এবং অবশিষ্ট গ্যাস মিশ্রণ থেকে CS_2-কে H_2 গ্যাস ও Ni প্রভাবক দ্বারা H_2S গ্যাসে রূপান্তর ও সব H_2S কে Fe_2O_3 দ্বারা শোষণ এবং শেষে HCN গ্যাসকে NaOH ও $FeSO_4$ দ্বারা অপসারিত করে, যে গ্যাস মিশ্রণ পাওয়া যায় তা হলো **কোল গ্যাস**। বকযন্ত্রে অবশিষ্ট রূপে যে কালো গুড়ো পদার্থ পড়ে থাকে, তাকে কোক (Coke) কার্বন বলে।

কোল গ্যাস মিশ্রণে মিথেন, H_2, CO, ইথিলিন, অ্যাসিটিলিন, বেনজিন বাষ্প ও N_2 গ্যাস মিশ্রিত থাকে।

কোল গ্যাসের ব্যবহার : কোল গ্যাস জ্বালানি হিসেবে বিভিন্ন শিল্পে তাপ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন শহরে আলো উৎপাদকরূপে এবং ধাতু নিষ্কাশনে বিজারক পরিবেশ সৃষ্টিতে কোল গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

কোক (coke) কার্বনের ব্যবহার : কোক কার্বন দৈনন্দিন কাজে জ্বালানি হিসেবে, ধাতু নিষ্কাশনে বিজারকরূপে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কোক কার্বন প্রোডিউসার গ্যাস ও ওয়াটার গ্যাস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

(ii) ওয়াটার গ্যাস (Water gas) : লোহিত তপ্ত কোক কার্বনের ওপর দিয়ে স্টিম চালনা করে ওয়াটার গ্যাস উৎপাদন করে। ওয়াটার গ্যাস হলো সম-মোলার কার্বন মনোক্সাইড (CO) ও H_2 গ্যাসের মিশ্রণ।

$$C(s) + H_2O(\text{Sleam}) \xrightarrow{1400^\circ C} [CO\,(g) + H_2\,(g)]\ (\text{ওয়াটার গ্যাস})$$

বাস্তবে এ গ্যাসের মধ্যে স্বল্প পরিমাণে CO_2, CH_4 ও N_2 গ্যাস ভেজালরূপে থাকে। ওয়াটার গ্যাসের H_2 উপাদানটি নীল শিখাসহ জ্বলে ওঠে বলে ওয়াটার গ্যাসকে **ব্লু-গ্যাস**ও বলা হয়।

ওয়াটার গ্যাসের ব্যবহার : বিভিন্ন শিল্পে চুল্লির জ্বালানি হিসেবে ওয়াটার গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ধাতু নিষ্কাশনে বিজারকরূপে ওয়াটার গ্যাস বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া CH_4 গ্যাস ও মিথানল উৎপাদনে ওয়াটার গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

(iii) মিথেন গ্যাস উৎপাদন : লোহিত তপ্ত কোক কার্বনের ওপর দিয়ে স্টিম চালনা করলে ওয়াটার গ্যাস উৎপন্ন হয়। পরে ওয়াটার গ্যাস ও সমআয়তন H_2 গ্যাসের মিশ্রণকে 300°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত Ni চূর্ণের ওপর দিয়ে চালনা করলে মিথেন গ্যাস ও পানি বাষ্প উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন গ্যাস মিশ্রণকে শীতল করলে পানি বাষ্প তরল পানিতে পরিণত হয়। শেষে মিথেন গ্যাস পাওয়া যায়।

$$C(s) + H_2O\ (\text{steam}) \xrightarrow{1400^\circ C} CO\,(g) + H_2\,(g)$$

$$\underbrace{[CO\,(g) + H_2(g)]}_{\text{ওয়াটার গ্যাস}} + 2H_2(g) \xrightarrow[Ni]{300^\circ C} \underbrace{CH_4(g) + H_2O\ (\text{steam})}_{\text{মিথেন}}$$

CH_4 এর ব্যবহার : মিথেন গ্যাস জ্বালানি হিসেবে এবং ইউরিয়া সার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

(iv) সংশ্লেষ গ্যাস (Synthetic gas) : মিথেন গ্যাসকে স্টিম সহ উচ্চ চাপে ও প্রায় 900°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত Ni প্রভাবকের ওপর চালনা করলে সংশ্লেষ গ্যাস উৎপন্ন হয়। **সংশ্লেষ গ্যাস হলো** এক মোল CO গ্যাস ও তিন মোল H_2 গ্যাসের মিশ্রণ।

$$CH_4(g) + H_2O(g) \xrightarrow[\text{উচ্চচাপ}]{900°C\ Ni} CO(g) + 3H_2(g)$$

সংশ্লেষ গ্যাসের ব্যবহার : সংশ্লেষ গ্যাস শিল্পক্ষেত্রে জ্বালানি ও বিজারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সংশ্লেষ গ্যাস থেকে মিথানল উৎপাদন করা হয়।

(v) প্রোডিউসার গ্যাস (Producer gas) : লোহিত তপ্ত কোক কার্বনের ওপর দিয়ে 1100°C তাপমাত্রায় বায়ু চালনা করলে মূলত CO গ্যাস ও N_2 গ্যাসের মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাকে **প্রোডিউসার গ্যাস বলে**। স্টিল নির্মিত চুল্লির নাম হলো 'প্রোডিউসার'। এ চুল্লির নামানুসারে এতে উৎপাদিত গ্যাসটির নাম হয়েছে প্রোডিউসার গ্যাস।

$$2C(s) + O_2(g) + N_2(g) \xrightarrow{1100°C} 2CO(g) + N_2(g)$$

প্রোডিউসার গ্যাসের ব্যবহার : স্টিল, কাচ প্রভৃতি শিল্পে চুল্লি উত্তপ্ত করার জন্য প্রোডিউসার গ্যাস ব্যবহৃত হয়। কোল গ্যাস উৎপাদনে বক-যন্ত্রকে উত্তপ্ত করার জন্য প্রোডিউসার গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ধাতু নিষ্কাশনে এটি বিজারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৩) কয়লার তরল জ্বালানি : পেট্রোল সংশ্লেষণ : লোহিত তপ্ত কোক কার্বনের ওপর স্টিম চালনা করে ওয়াটার গ্যাস প্রস্তুতি করা হয়। পরে CO গ্যাস ও H_2 গ্যাসের এ মিশ্রণকে প্রায় 200°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত কোবাল্ট প্রভাবকের ওপর 5–10 atm চাপে চালনা করা হয়। তখন কৃত্রিম উপায়ে পেট্রোল বা তরল হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ উৎপন্ন হয়। তরল অ্যালকেন জ্বালানি উৎপাদনের এ পদ্ধতিকে ফিশার-ট্রপস পদ্ধতি বলে।

$$C(s) + H_2O(g) \xrightarrow{1400°C} \underset{\text{ওয়াটার গ্যাস}}{CO(g) + H_2(g)}$$

$$nCO(g) + (2n+1)H_2(g) \xrightarrow[5–10\ atm]{200°C,\ Co} \underset{\text{অ্যালকেন}}{C_nH_{2n+2}} + nH_2O$$

এরূপে ফিশার ট্রপস পদ্ধতিতে কয়লা থেকে তরল জ্বালানি গ্যাস তৈরি করে LPG বা তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস সিলিন্ডারজাত করা যেতে পারে।

LPG হলো নিম্ন আণবিক ভরবিশিষ্ট হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। এর মূল উপাদান হলো n-বিউটেন, প্রোপেন, iso-বিউটেন, বিউটিন। এছাড়া প্রোপিলিন ও ইথেন অল্প পরিমাণে থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় উচ্চ চাপে (প্রায় 6 atm) LPG কে তরলে পরিণত করে উচ্চ চাপসহ স্টিলের সিলিন্ডারে ভর্তি করে বাজারে সরবরাহ করা হয়।

LPG এর ক্যালরিফিক মান প্রায় 29500 kcal/m^3 হয়। LPG গন্ধহীন; এর বিষক্রিয়া নেই; তবে শ্বাস রোধের সম্ভাবনা থাকে। LPG সিলিন্ডারে লিকেজ হচ্ছে কীনা তা জানার জন্য তীব্র গন্ধযুক্ত ভারী মারক্যাপটান যৌগ CH_3SH (গ্যাস) অথবা C_2H_5SH (তরল) যোগ করা হয়।

(খ) রাসায়নিক শিল্পে কার্বনের ব্যবহার : (i) লৌহের অক্সাইড আকরিক যেমন, আকরিক ম্যাগনেটাইট (Fe_3O_4) ও রেড হিমাইট (Fe_2O_3) কে বাত্যাচুল্লিতে কোক কার্বনসহ বিজারিত করে লৌহ নিষ্কাশন করা হয়।

$$2C(s) + O_2(g) \xrightarrow{900°C} 2CO(g)$$

$$Fe_3O_4(s) + 4CO(g) \longrightarrow 3Fe(s) + 4CO_2(g)$$

$$Fe_2O_3(s) + 3CO(g) \longrightarrow 2Fe(s) + 3CO_2(g)$$

(ii) বিটুমিনাস কয়লার বিধ্বংসী পাতনে কোল গ্যাস ও আলকাতরা পাওয়া যায়। আবার আলকাতরার আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় বেনজিন, টলুইন, জাইলিন, ফেনল ও ন্যাফথ্যালিন উৎপাদন করা হয়। কয়লার বিধ্বংসী পাতনে অবশেষরূপে যে পিচ (Pitch) পাওয়া যায়, তা রোড-কার্পেটিং কাজে ব্যবহৃত হয়।

জেনে নাও : (১) কোল গ্যাসে থাকে → CH_4, H_2, CO, N_2, ইথিলিন, অ্যাসিটিলিন ও বেনজিন-বাষ্প।
(২) ওয়াটার গ্যাসে থাকে → 1ঃ1 মোল অনুপাতে CO ও H_2 গ্যাস।
(৩) সংশ্লেষ গ্যাসে থাকে → 1ঃ3 মোল অনুপাতে CO ও H_2 গ্যাস।
(৪) প্রোডিউসার গ্যাসে থাকে → 2ঃ1 মোল অনুপাতে CO ও N_2 গ্যাস।

৫.৩ জ্বালানি সম্পদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে শিল্পায়নের সম্ভাবনা

Fuel Resources and Industrial Possibility in Bangladesh

যে কোনো দেশের শিল্পায়ন সে দেশের জ্বালানি সম্পদের ওপর মূলত নির্ভরশীল। শিল্প কারখানার উন্নতির মূলে রয়েছে স্বল্প মূল্যে জ্বালানির যোগান দেয়া। আধুনিক যুগে শিল্পের উন্নত যন্ত্রপাতি বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে। বর্তমানে বাংলাদেশে জ্বালানি সম্পদ বলতে আবিষ্কৃত **26টি প্রাকৃতিক গ্যাস** ক্ষেত্র, সিলেটে নতুন আবিষ্কৃত একটি তেলখনি এবং **পাঁচটি কয়লার খনি** আছে।

(১) প্রাপ্ত তথ্য মতে আগামী 10–15 বছর যাবৎ বাংলাদেশের খনিতে প্রাপ্ত কয়লা থেকে দেশে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও যোগান দেয়া সম্ভব।

(২) এছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার রাশিয়ার সাথে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করেছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ অধিক হারে যোগান দেয়া সম্ভব হবে।

(৩) তখন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাদ দেয়া সম্ভব হবে। এর পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস রাসায়নিক শিল্পে অধিক হারে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

(৪) তাই বলা যায়, কয়লা সম্পদের সঠিকভাবে উত্তোলন এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পে কয়লা সম্পদের ব্যবহারে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করলে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠবে।

(৫) অপরদিকে প্রাকৃতিক গ্যাসের রাসায়নিক শিল্পে অধিক ব্যবহারে নতুন রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। মোট কথা জ্বালানি সম্পদের সুচিন্তিত ব্যবহার বাংলাদেশে অধিক শিল্পায়নের ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে।

৫.৪ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রসায়ন শিল্প পরিচিতি

Important Chemical Industries of Bangladesh

বাংলাদেশে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে রসায়ন শিল্প গড়ে ওঠেছে। যেমন– (১) রাসায়নিক সার, (২) সিমেন্ট, (৩) চিনি, (৪) সাবান ও প্রসাধনী সামগ্রী, (৫) কাচ ও সিরামিক, (৬) চামড়া টেনিং, (৭) প্লাস্টিক ও পলিমার শিল্প, (৮) কাগজ ও পাল্প শিল্প, (৯) ওষুধ শিল্প ও (১০) বিভিন্ন পানীয় উৎপাদন শিল্প।

এসব রাসায়নিক শিল্পে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের মালিকানা আছে। সরকারি রাসায়নিক কারখানাসমূহের পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (Bangladesh Chemical Industries Corporation, BCIC) রয়েছে। এ সংস্থার অধীনে পরিচালিত কারখানাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে দেয়া হলো :

(ক) সিমেন্ট শিল্প :

১। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড : এটি সুনামগঞ্জের ছাতকে 1938 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 190,000 মেট্রিক টন সিমেন্ট। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সিমেন্ট কারখানা; এটিতে কাঁচামাল থেকে সিমেন্ট তৈরি করা হয়।

এছাড়া অনেক সিমেন্ট কারখানা আছে। এরা বিদেশ থেকে ক্লিংকার আমদানি করে এবং ঐ ক্লিংকারগুঁড়ার সাথে ৩% জিপসাম গুঁড়া মিশিয়ে সিমেন্ট উৎপাদন করে। এদের মধ্যে আছে (১) চিটাগাং সিমেন্ট এবং ক্লিংকার কারখানা, (২) সুনামগঞ্জের ল্যাফার্জ সিমেন্ট কোম্পানি, (৩) রুবি সিমেন্ট, (৪) কনফিডেন্স সিমেন্ট, (৫) আরামিট সিমেন্ট, (৬) প্রিমিয়ার সিমেন্ট, (৭) হাইডেলবার্গ সিমেন্ট ও (৮) ফ্রেস সিমেন্ট ইত্যাদি।

(খ) পাল্প, কাগজ ও হার্ড বোর্ড শিল্প :

১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেড : এটি রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় 1950–53 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে কাগজ ও পাল্প তৈরি হয়। এর উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। BCIC এর ওয়েবসাইটে এর উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে বর্তমানে কোনো তথ্য নেই।

২। খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লিমিটেড : এটি খুলনার খালিশপুরে 1968 সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 300 লক্ষ বর্গফুট হার্ডবোর্ড।

(গ) কাচ ও সিরামিক শিল্প :

১। উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি লিমিটেড : এটি চট্টগ্রামের কালুরঘাট শিল্প এলাকায় অবস্থিত। 1959 সনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বার্ষিক উৎপাদন 18.67 মিলিয়ন বর্গফুট কাচের শিট (২ মি. মি. হতে ৬.৬ মি. মি পর্যন্ত)।

২। বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড সেনিটারি ওয়্যার ফ্যাক্টরি লিমিটেড : এটি ঢাকার মিরপুরে 1979 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারখানার বার্ষিক উৎপাদন 3400 মেট্রিক টন।

(ঘ) সার কারখানা :

১। ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (NGFF) : এটি সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে 1961 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 10,600 মেট্রিক টন **ইউরিয়া**।

২। টিএসপি কমপ্লেক্স লিমিটেড : চট্টগ্রামের নর্থ পতেঙ্গায় 1968 সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারখানায় বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 100,000 টন টিএসপি সার।

৩। ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (UFFL) : এটি নরসিংদির ঘোড়াশালে 1970 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 4,70,000 মেট্রিক টন **ইউরিয়া**।

৪। আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (AFCL) : এ কারখানা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে 1981 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 5,28,000 মেট্রিক টন **ইউরিয়া**।

৫। পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (PUFF) : এটি নরসিংদির পলাশে 1985 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 95,000 মেট্রিক টন।

৬। চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (CUFL) : চট্টগ্রামের রাঙাদিয়ায় এটি 1987 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ফ্যাক্টরিতে প্রতি বছর 5,61,000 মেট্রিক টন **ইউরিয়া** সার উৎপাদিত হয়। এ কারখানায় ইউরিয়া উৎপাদন শুরু হয় 1989 সালে।

৭। যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (JFCL) : এটি জামালপুরের তারাকান্দিতে 1989 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 5,61,000 মেট্রিক টন **ইউরিয়া**। এটিতে ইউরিয়া উৎপাদন শুরু হয় 1991 সালে।

৮। **কর্ণফুলি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (KAFCO) :** এটি চট্টগ্রাম শহরের 22 কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এটি 1995 সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউরিয়া সারকারখানা। এ সারকারখানায় বাংলাদেশসহ জাপান, ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডের কোম্পানির মালিকানা রয়েছে। এ কারখানাটির বার্ষিক 6,80,000 মেট্রিক টন দানা **ইউরিয়া** উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে, তবে বর্তমানে 5,75, 425 মেট্রিক টন দানা ইউরিয়া উৎপাদন করা হচ্ছে। এতে অনার্দ্র অ্যামোনিয়াও তৈরি করা হয়।

৯। **ডিএপি (DAP) ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড :** এটি চট্টগ্রামের রাঙ্গাদিয়ায় অবস্থিত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় 2006 সালে। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 5,28,000 মেট্রিক টন ডাইঅ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি)।

এছাড়া বাংলাদেশে সরকারি চিনি ও খাদ্যদ্রব্যের কারখানাসমূহের একটি কর্পোরেশন বিদ্যমান। 1976 সালের ১ জুলাই সরকারি আদেশে বাংলাদেশ সুগার মিলস্ কর্পোরেশন (Bangladesh Sugar Mills Corporation, BSMC) এবং বাংলাদেশ ফুড এন্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (Bangladesh Food and Allied Industries Corporation, BFAIC)- এ দুটো কর্পোরেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation, BSFIC) গঠিত হয়। এর অধীনস্থ কারখানাসমূহ হলো,

(ঙ) চিনি শিল্প :

(১) পঞ্চগড় সুগার মিল লিমিটেড; : এটির বার্ষিক উৎপাদন 10,160 মেট্রিক টন চিনি।
(২) সেতাবগঞ্জ সুগার মিল লিমিটেড, : দিনাজপুরের এ মিলের বার্ষিক উৎপাদন 12,500 মেট্রিক টন চিনি।
(৩) ঠাকুরগাও সুগার মিলস লিমিটেড; : এটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 15,240 মেট্রিক টন।
(৪) শ্যামপুর সুগার মিল লিমিটেড; : এটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 10,160 মেট্রিক টন।
(৫) রংপুর সুগার মিল লিমিটেড; : এটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 15,000 মেট্রিক টন।
(৬) রাজশাহী সুগার মিল লিমিটেড; : এটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 20,000 মেট্রিক টন চিনি।
(৭) জয়পুরহাট সুগার মিল লিমিটেড; : এটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 20,320 মেট্রিক টন চিনি।
(৮) নাটোর সুগার মিল লিমিটেড; : এটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 15,000 মেট্রিক টন।
(৯) নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল লিমিটেড, : গোপালপুর, নাটোর; এটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা15,000 মেট্রিক টন।
(১০) পাবনা সুগার মিল লিমিটেড; : এটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 15,000 মেট্রিক টন চিনি।
(১১) কুষ্টিয়া সুগার মিল লিমিটেড; : এটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 15,240 মেট্রিক টন চিনি।
(১২) মোবারকগঞ্জ সুগার মিল লিমিটেড, ঝিনাইদহ; : এটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 15000 মেট্রিক টন চিনি।
(১৩) ফরিদপুর সুগার মিল লিমিটেড; : এটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 10,160 মেট্রিক টন চিনি।
(১৪) কেরু এন্ড কোং, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা; : উৎপাদন ক্ষমতা 11,150 মেট্রিক টন চিনি ও 2.8 মিলিয়ন লিটার স্পিরিট।
(১৫) ঝিনাই সুগার মিল লিমিটেড, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুরের : এ মিলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 10,160 মেট্রিক টন চিনি।

৫.৫.১ ইউরিয়া উৎপাদনের মূলনীতি

Principle of Urea Production

মূলনীতি : অ্যামোনিয়া ও CO_2 গ্যাস হতে ইউরিয়া **উৎপাদন করা হয়।** অধিক চাপে (120–130 atm) ও 180°C–190°C তাপমাত্রায় অ্যামোনিয়া ও CO_2 এর বিক্রিয়ায় প্রথমে অ্যামোনিয়াম কার্বামেট এবং পরে এটি নিরুদিত হয়ে ইউরিয়া উৎপন্ন করে।

অর্থনৈতিক রসায়ন

$$2NH_3\,(g) + CO_2 \xrightarrow{180^\circ C,\ 130\ atm,} H_2NCOONH_4 \text{ (অ্যামোনিয়াম কার্বামেট)}$$

$$H_2N{-}COONH_4 \xrightarrow{180^\circ C,\ 130\ atm,} H_2N{-}CO{-}NH_2 + H_2O$$

ইউরিয়া

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস মিথেন থেকে ইউরিয়া উৎপাদনে ব্যবহৃত NH_3 ও CO_2 নিম্নোক্ত ধাপে প্রস্তুত করা হয়

(১) প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে H_2 ও CO_2 গ্যাস উৎপাদন,

(২) প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে উৎপাদিত H_2 ও বায়ুস্থ N_2 থেকে NH_3 উৎপাদন ও

(৩) NH_3 গ্যাস ও CO_2 হতে ইউরিয়া উৎপাদন।

(১) প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে H_2 ও CO_2 গ্যাস উৎপাদন :

(i) প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে সালফার মুক্তকরণ : প্রথমে প্রাকৃতিক গ্যাসের জৈব সালফার মুক্ত করার জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসকে H_2 গ্যাসসহ উত্তপ্ত Co-Mo প্রভাবক মিশ্রণের ওপর দিয়ে চালনা করা হয়।

$$\text{জৈব সালফার যৌগ} + H_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{Co. Mo}} H_2S + \text{সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন}$$

এরপর নির্গত প্রাকৃতিক গ্যাস মিশ্রণকে উত্তপ্ত ZnO প্রভাবকের ওপর দিয়ে চালনা করে সমস্ত H_2S মুক্ত করা হয়।

$$ZnO + H_2S \xrightarrow{\Delta} ZnS + H_2O$$

(ii) মিথেনকে স্টিম ও বায়ুর O_2 সহ জারণে CO_2 সহ N_2 ও H_2 (1 ঃ 3) উৎপাদন : সালফার মুক্ত মিথেন গ্যাস ও স্টিমের মিশ্রণকে 450°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত Ni প্রভাবকের ওপর মিথেন দিয়ে চালনা করা হয়। তখন **90% মিথেন গ্যাস** জারিত হয়ে CO_2 ও H_2 গ্যাসে পরিণত হয়।

$$CH_4(g) + 2H_2O(g) \xrightarrow{\text{Ni; } 450^\circ C} CO_2\,(g) + 4\,H_2\,(g)$$

এরপর নির্গত CO_2, H_2 ও 10% CH_4 গ্যাস মিশ্রণের সমস্ত CH_4 গ্যাসকে জারিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাতাসসহ 500°C এ উত্তপ্ত Fe_2O_3 ও Cr_2O_3 প্রভাবক মিশ্রণের ওপর দিয়ে চালনা করা হয়। তখন বাতাসের O_2 এর সাথে H_2 এর বিক্রিয়ায় জলীয় বাষ্প এবং উৎপন্ন জলীয় বাষ্প ও CH_4 এর বিক্রিয়ায় CO_2 ও H_2 উৎপন্ন হয়। শেষে উৎপন্ন CO_2 কে K_2CO_3 এর দ্রবণে শোষণ করা হয়। তখন অবশিষ্ট H_2 ও বাতাসের 78% N_2 নির্গত গ্যাস মিশ্রণে থেকে যায়।

$$2H_2(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2H_2\,O\,(g)$$

$$CH_4\,(g) + 2H_2O\,(g) \xrightarrow[Cr_2O_3]{Fe_2O_3;\ 500^\circ C} CO_2\,(g) + 4H_2\,(g)$$

$$K_2CO_3\,(aq) + CO_2\,(g) + H_2O\,(l) \longrightarrow 2KHCO_3\,(aq)$$

CO_2 পুনরুদ্ধার : CO_2 এর শোষণের পরে নির্গত গ্যাস মিশ্রণে N_2 ও H_2 এর পরিমাণ 1 ঃ 3 অনুপাতে থাকে। এ গ্যাস মিশ্রণ অ্যামোনিয়া উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

পরে $KHCO_3$ দ্রবণকে নিম্নচাপে উত্তপ্ত করলে এটি বিযোজিত হয়ে K_2CO_3 ও CO_2 গ্যাস পুনরায় উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন CO_2 গ্যাস ইউরিয়া উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

$$2KHCO_3(aq) \xrightarrow[\text{নিম্নচাপে}]{\Delta} K_2CO_3 + H_2O(l) + \boxed{CO_2(g)}$$

(২) অ্যামোনিয়া উৎপাদন : নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের 1ঃ 3 অনুপাতের মিশ্রণটিকে 500°C এ উত্তপ্ত Fe চূর্ণ ও প্রভাবক সহায়ক Al_2O_3 মিশ্রণের ওপর দিয়ে 200 atm চাপে চালনা করলে হেবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

$$N_2(g) + 3H_2(g) \xrightarrow[500°C,\ 200\ atm]{Fe, Al_2O_3} \boxed{2NH_3(g)}$$

ইউরিয়া উৎপাদন : প্রায় 120 –130 atm চাপে ও 180°C– 190°C তাপমাত্রায় NH_3 গ্যাস ও CO_2 গ্যাসের বিক্রিয়ায় প্রথমে অ্যামোনিয়াম কার্বামেট এবং পরে এটি নিরুদ্রিত হয়ে ইউরিয়া উৎপন্ন করে।

$$2NH_3(g) + CO_2(g) \xrightarrow{180°C,\ 130\ atm} \underset{\text{অ্যামোনিয়াম কার্বামেট}}{H_2N\text{-}COONH_4}$$

$$H_2N\text{-}COONH_4 \xrightarrow{180°C,\ 130\ atm} \underset{\text{ইউরিয়া}}{H_2N\text{-}CO\text{-}NH_2} + H_2O$$

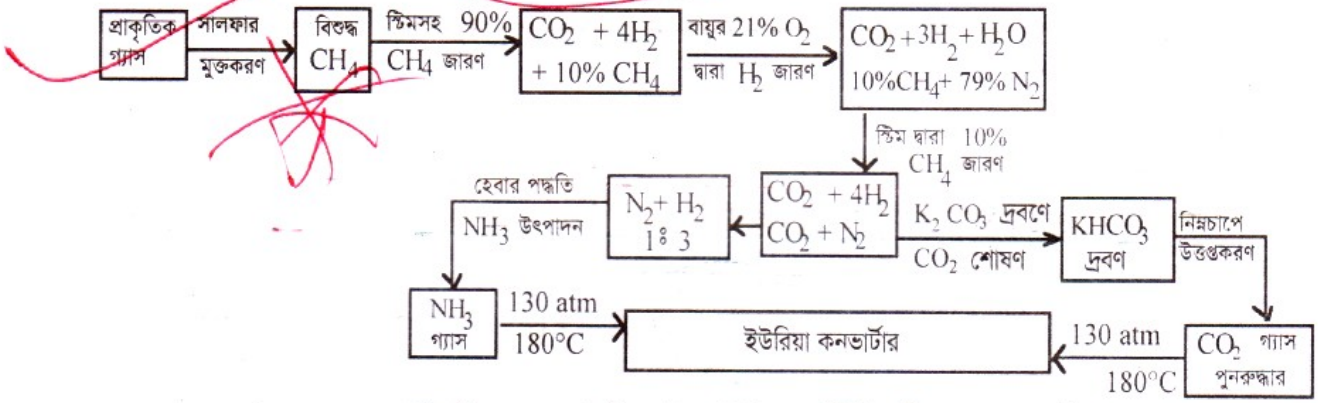

প্রবাহ চিত্র : ৫.৪ : প্রাকৃতিক গ্যাস CH_4 থেকে ইউরিয়া উৎপাদকের প্রবাহচিত্র

MCQ-5.4 : প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য সুফল হলো :

(i) বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্বারা শিল্পায়ন ঘটছে, (ii) জ্বালানি সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রয়েছে।

(iii) নাইট্রোজেন ফিক্সেশন সম্ভব হয়েছে।

কোনটি সঠিক হবে?

(ক) (i) ও (ii) (খ) (ii) ও (iii) (গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

শিক্ষার্থীর কাজ :

প্রশ্ন-৫.৩(ক) উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক যে সারটি বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে উৎপাদন করা হয়, এর উৎপাদনের মূলনীতি সমীকরণসহ বর্ণনা কর। [ঢা. বো. ২০১৫]

প্রশ্ন-৫.৩(খ) ইউরিয়া উৎপাদন শিল্প হতে সৃষ্ট দূষকসমূহের ক্ষতিকর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। [ঢা. বো. ২০১৫]

প্রশ্ন ৫.৪: নিচের উদ্দীপকটি অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও। [ঢা. বো. ২০১৬]

প্রাকৃতিক গ্যাস → H_2 $\xrightarrow[\Delta,\ \text{চাপ}]{N_2}$ X $\xrightarrow{CO_2}$ ইউরিয়া

(ক) উদ্দীপক মতে শেষ যৌগটি উৎপাদনের মূলনীতি সমীকরণসহ লেখ।

(খ) উদ্দীপকের X যৌগটির সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদনের নিয়ামকসমূহের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন ৫.৫ : নিচের উদ্দীপকটি অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও। [ব. বো. ২০১৬]

$$A_2(g) + 3B_2(g) \xrightarrow[200\ atm]{450^\circ C,\ Fe} \boxed{E} \xrightarrow{CO_2} \text{কার্বামেট} \xrightarrow{\Delta} \boxed{D}$$

(ক) উদ্দীপক মতে D উৎপাদনে সৃষ্ট দূষকগুলো কীভাবে পরিবেশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা ব্যাখ্যা কর।

(খ) উৎপাদ E যৌগের 99.7% পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৫.৬ : নিচের উদ্দীপক অনুসারে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও। [চ. বো. ২০১৬]

CH_4	CFC	CO_2	NH_3
(i)	(ii)	(iii)	(iv)

(ক) উদ্দীপকের কোন কোন যৌগ ব্যবহার করে ইউরিয়া উৎপাদন করা যায় তা সমীকরণসহ লেখ।

(খ) ওজোন স্তরের সাথে উদ্দীপকের কোন যৌগটির বিক্রিয়া পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর তা বিশ্লেষণ কর।

জেনে নাও : (১) নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাস সার উদ্ভিদের বৃদ্ধি, মূলের বৃদ্ধি ও ফুল-ফল ধারণের জন্য অপরিহার্য। N গঠিত ইউরিয়া সার উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্যে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় সার। বীজ বপন ও চারা রোপণের পর ইউরিয়া সার যে কোনো ফসলের বৃদ্ধির জন্য প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রয়োজন। ফসফরাস গঠিত ফসফেট সার উদ্ভিদের মূল বৃদ্ধিতে এবং পটাস সার (KCl) উদ্ভিদের ফুল ফল ধারণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

(২) ইউরিয়া সার সিক্ত মাটিতে প্রথমে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে NH_3 ও CO_2 উৎপন্ন করে। উৎপন্ন NH_3 মাটির নাইট্রোসোমোনাস জীবাণুর প্রভাবে জারিত হয়ে নাইট্রাস এসিড (HNO_2) ও পরে নাইট্রিফাইং জীবাণুর প্রভাবে জারিত হয়ে HNO_3 উৎপন্ন হয়; যা মাটির চুন জাতীয় ক্ষার বস্তুর সাথে বিক্রিয়ায় দ্রবণীয় নাইট্রেট লবণ তৈরি করে। উদ্ভিদ মূল দ্বারা নাইট্রেট লবণ শোষণ করে প্রোটিন সংশ্লেষণে যোগান দেয়। উৎপন্ন প্রোটিন উদ্ভিদের দেহ বৃদ্ধি করে।

$$CO(NH_2)_2 + H_2O \rightarrow 2NH_3 + CO_2; \qquad 2NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{\text{ব্যাকটেরিয়া}} 2HNO_2 + 2H_2O$$

$$2HNO_2 + O_2 \xrightarrow{\text{ব্যাকটেরিয়া}} 2HNO_3; \qquad 2HNO_3 + CaO \rightarrow Ca(NO_3)_2 + H_2O$$

৫.৫.২ কাচ বা গ্লাস উৎপাদনের মূলনীতি

Principle of Glass Production

কাচের সংজ্ঞা : কাচ বা গ্লাস হলো রাসায়নিক গঠনগতভাবে সোডিয়াম-ক্যালসিয়াম-দ্বি সিলিকেট মিশ্রণ, যা দেখতে স্বচ্ছ, শক্ত কিন্তু ভঙ্গুর, অনিয়তাকার (non-crystalline) কঠিন পদার্থ। কাচের কোনো নির্দিষ্ট সংকেত বা সংযুক্তি নেই।

★ কেলাসাকার কঠিন পদার্থ যেমন NaCl এর নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক (801°C) থাকলেও কাচের কোনো সুনির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নেই। কাচকে তাপ দিলে ধীরে ধীরে নরম হয় অর্থাৎ গলন শুরু হয় (প্রাথমিক গলনাঙ্ক) এবং তাপমাত্রার একটি বিস্তৃত সীমার (যেমন প্রায় (500°C) মধ্যে সম্পূর্ণ গলে গিয়ে (সর্বোচ্চ গলনাঙ্কে) সর্ব নিম্ন সান্দ্রতা (10^1 poise) যুক্ত তরলে পরিণত হয়।

★★ **কাচ হলো অত্যধিক শীতলীকৃত তরল :** কাচ অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ বটে। কিন্তু কঠিন পদার্থের নিয়তাকার (crystalline) ও অনিয়তাকার গঠনের সংজ্ঞা মতে, অনিয়তাকার কঠিন পদার্থকে প্রকৃত কঠিন পদার্থ বলা যায় না। কারণ কাচ বা অনিয়তাকার পদার্থের অভ্যন্তরে 'সূক্ষ্ম একক'গুলোর মধ্যে **ধীর গতিতে প্রবাহ** হয়ে থাকে। তাই অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ কাচকে উচ্চ সান্দ্রতা (viscosity) **সম্পন্ন অত্যধিক শীতলীকৃত তরল** (supercooled liquid) পদার্থ বলা হয়। এরূপ পদার্থের মধ্যে পলিমারসমূহ অন্তর্ভুক্ত; [অনুচ্ছেদ-২.১৮, পলিমার গ্লাস দ্রষ্টব্য]।

কাচের উপাদান : অনেক ধরনের কাচ বাজারে পাওয়া যায়। এদের সংযুক্তি বিভিন্ন। তবে কাচ তৈরির প্রধান উপাদান হলো সিলিকা বালি (SiO_2), চুন বা চুনাপাথর ও সোডা অ্যাস (Na_2CO_3)। এ তিনটি মূল উপাদান থেকে উৎপাদিত সাধারণ কাচের মোটামুটি সংযুক্তি হলো $Na_2O.CaO.6SiO_2$।

কাচ উৎপাদনের মূলনীতি : (১) কাচের **প্রধান তিনটি মূল উপাদানকে** নির্দিষ্ট অনুপাতে যেমন 100 ভাগ সিলিকা (SiO_2), 35 ভাগ সোডা অ্যাস (Na_2CO_3) ও 15 ভাগ চুনাপাথর ($CaCO_3$) গুঁড়ার মিশ্রণকে 1450°C – 1500°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে স্বচ্ছ গলিত কাচ উৎপন্ন হয়।

$$Na_2CO_3 + CaCO_3 + 6SiO_2 \xrightarrow{1450°C} \underset{\text{কাচ}}{Na_2O.CaO.\ 6SiO_2} + 2CO_2$$

(২) সোডা অ্যাসের পরিবর্তে সল্ট কেক অ্যাস (Na_2SO_4) ও চারকোল মিশ্রণ সিলিকা বালি ও চুনাপাথর গুঁড়াসহ উত্তপ্ত করে গ্লাস তৈরি করা হয়। প্রথমে সোডিয়াম সালফেট সোডিয়াম সিলিকেটে পরিণত হয়।

$$2Na_2SO_4 + 2SiO_2 + C \xrightarrow{\Delta} 2Na_2\ SiO_3 + CO_2 + 2SO_2$$

$$Na_2SiO_3 + CaCO_3 + 5SiO_2 \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{কাচ}}{Na_2O.CaO.\ 6SiO_2} + CO_2$$

কাচের গৌণ উপাদান : গৌণ উপাদানরূপে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কাচ তৈরির জন্য নিচের দুই বা ততোধিক উপাদান ওপরের মূল উপাদানের সাথে মিশিয়ে চুল্লিতে উত্তপ্ত করা হয়। গৌণ উপাদানগুলো হলো পটাশ (K_2CO_3), $BaSO_4$, $BaCO_3$, বোরিক এসিড (H_3BO_3), বোরাক্স ($Na_2B_4O_7$), জিংক কার্বনেট ($ZnCO_3$), কেওলিন বা চীনা মাটি ($Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O$)। এছাড়া,

(i) রঙিন কাচ তৈরিতে অবস্থান্তর ধাতুর অক্সাইড যেমন Cu_2O, FeO, Fe_2O_3, Cr_2O_3, NiO মূল উপাদানের সাথে যোগ করা হয়।

(ii) অস্বচ্ছ কাচ তৈরির জন্য অ্যান্টিমনি, টিন ও আর্সেনিক অক্সাইড বা সালফাইড যোগ করা হয়।

(iii) সিলিকা বালিতে FeO থাকলে উৎপন্ন কাচ সবুজ বর্ণের এবং Fe_2O_3 থাকলে হলুদাভ হয়। তখন কাচকে বর্ণহীন করার জন্য বিরঞ্জকরূপে MnO_2 যোগ করা হয়।

(iv) গলিত কাচে আবদ্ধ গ্যাস-বুদবুদ যেমন CO_2 ও SO_2 দূর করার জন্য স্বচ্ছকারকরূপে $NaNO_3$, Al_2O_3, NH_4Cl ইত্যাদি যোগ করা হয়।

কাচ সামগ্রী উৎপাদন পদ্ধতি : কাচের সামগ্রী উৎপাদন নিম্নোক্ত চারটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়। যেমন;

(১) চুল্লিতে বা ফার্নেসে মূল উপাদানের গলন,
(২) গলিত কাচকে বিভিন্ন সামগ্রীর আকৃতি প্রদান,
(৩) প্রস্তুত সামগ্রীর অ্যানিলিং বা কোমলায়ন বা ধীর শীতলকরণ ও
(৪) প্রস্তুত কাচ সামগ্রীর ফিনিশিং

(১) **ফার্নেসে গলন :** গলন ফার্নেসে মূল কাঁচামাল সিলিকা, সোডা অ্যাস, চুনাপাথর এবং গৌণ উপাদানসমূহ গুঁড়া করে প্রয়োজন মতো মিশানো হয়। এতে মোট চার্জের 8–10% পুরানো ভাঙ্গা কাচ **'কিউলেট'** (Cullet') নামে যোগ করা হয়। 'কিউলেট' বিগলক (Flux) রূপে কাঁচামাল মিশ্রণের গলন তাপমাত্রা হ্রাস করে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে, অপচয় রোধ করে।

(২) **গলিত কাচের বিভিন্ন সামগ্রীর আকৃতি প্রদান :** গলন চুল্লি থেকে বিগলিত কাচকে যান্ত্রিক উপায়ে ব্যবহারযোগ্য কাচের বিভিন্ন বস্তু বা সামগ্রীতে রূপান্তর করা হয়।

(৩) **প্রস্তুত সামগ্রীর অ্যানিলিং (Annealing) :** কাচ তাপ কুপরিবাহী; তাই উত্তপ্ত কাচ সামগ্রীকে হঠাৎ শীতল করলে এর অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশে অসম পীড়ন (Strain) সৃষ্টি হয়; ফলে কাচের ভঙ্গুরতা বেড়ে গিয়ে কাচসামগ্রী ফেটে যায়। তাই কাচের ভঙ্গুরতা রোধ করার জন্য উত্তপ্ত কাচ সামগ্রীকে কোমলায়ন তাপমাত্রায় (Softening temperature) বা

কাচের প্রাথমিক গলনাঙ্কের চেয়ে একটু বেশি এবং এর সংকট তাপমাত্রার কাছাকাছি দীর্ঘ সময় যাবৎ ধীরে ধীরে শীতল করতে হয়; এরূপ শীতলকরণ প্রক্রিয়াকে কাচ সামগ্রীর অ্যানিলিং বা **কোমলায়ন বলে**। কাচ সামগ্রী উৎপাদনে অ্যানিলিং একটি গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া।

[উল্লেখ্য কাচের প্রাথমিক গলনাঙ্কে কাচ ধীরে ধীরে নরম হতে থাকে এবং সংকট তাপমাত্রায় বা অ্যানিলিং তাপমাত্রায় গলিত কাচের সান্দ্রতা হ্রাস পেয়ে 10^{13} poise (পয়েস) হয়। [1 poise = 1 dyne. second/cm^2] সাধারণ কাচের অ্যানিলিং তাপমাত্রা 454°C – 482°C এর মধ্যে হয়। বোরো সিলিকেটের জন্য অ্যানিলিং তাপমাত্রা 780°C এর মধ্যে থাকে।]

(৪) কাচ সামগ্রীর ফিনিশিং (Finishing) : অ্যানিলিং প্রক্রিয়ার পর কাচের সামগ্রীকে রোলিং শান পাথরে পলিশ করে বাজারজাত করা হয়।

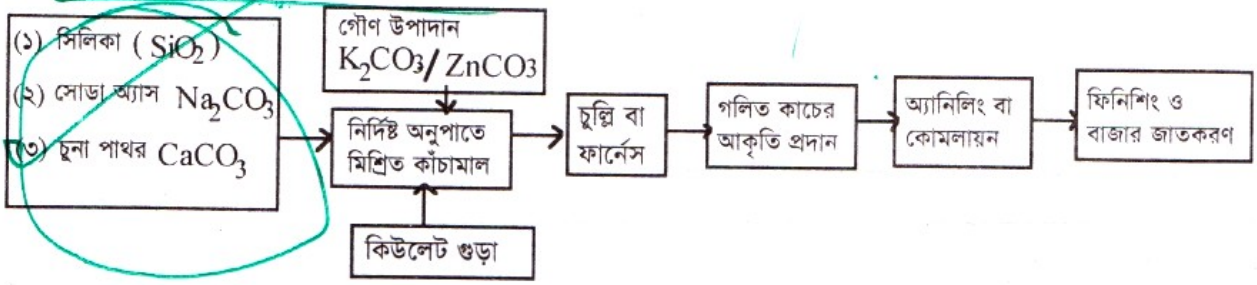

প্রবাহ চিত্র–৫.৫ : কাচ উৎপাদনের প্রবাহ চিত্র

বিভিন্ন প্রকার কাচ (Varieties of Glass)

(১) Soft glass বা সাধারণ কাচ বা সোডা গ্লাস : সোডা গ্লাসে সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম সিলিকেট থাকে। এর সাধারণ সংকেত হলো– $Na_2O.\ CaO.\ x\ SiO_2$। এটি তাপে সহজে গলে যায়। গ্লাস টিউব, সাধারণ কাচের জিনিস যেমন বোতল তৈরিতে Soft glass ব্যবহৃত হয়। Soft glass কে Bottle glassও বলে।

(২) Hard glass বা Refractory glass বা পটাস গ্লাস : Hard glass– এ পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম সিলিকেট থাকে। এর সাধারণ সংকেত হলো $-K_2O.CaO.\ x\ SiO_2$। এটি অধিক তাপে গলে। ব্যুরেট, পিপেট, বিকার ও শুক্ত কাচ যন্ত্রপাতি তৈরিতে hard glass ব্যবহৃত হয়।

(৩) Flint glass বা Optical glass বা লেড গ্লাস : Flint glass খুবই স্বচ্ছ। ফ্লিন্ট গ্লাসে সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও লেড সিলিকেট থাকে। এটির সাধারণ সংকেত হলো $Na_2O.\ K_2O.\ PbO.xSiO_2$। চশমার কাচ, বৈদ্যুতিক বাল্ব, optical যন্ত্রপাতি তৈরিতে লেড গ্লাস ব্যবহৃত হয়।

(৪) Crookes glass বা সেরিয়াম গ্লাস : Crookes glass হলো বিশেষ ধরনের optical glass, যা চোখের জন্য ক্ষতিকর UV রশ্মি প্রতিরোধ করে। এতে সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও সেরিক সিলিকেট থাকে; সাধারণ সংকেত হলো $Na_2O.\ K_2O.Ce_2O_3\text{-}x\ SiO_2$। চশমার কাচ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়।

(৫) Opal glass বা অর্ধ স্বচ্ছ সাদা কাচ : Opal glass- এ সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম (বা Mg), জিংক সিলিকেট ও CaF_2 থাকে; সাধারণ সংকেত হলো $Na_2O,\ MgO.\ ZnO.x\ SiO_2.\ CaF_2$। Opal glass বাতির শেড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(৬) Gena glass বা পাইরেক্স গ্লাস বা বোরো সিলিকেট গ্লাস : এতে অতিরিক্ত সিলিকেটরূপে জিংক বেরিয়াম বোরো সিলিকেট থাকে। Pyrex বা Gena Glass খুবই তাপসহ, শক্ত ও বিভিন্ন রাসায়নিক বিকারক প্রতিরোধী হয়। Pyrex গ্লাসের সংকেত হলো $Na_2O.\ K_2O.\ ZnO.\ BaO.\ x(SiO_2.\ B_2O_3)$।

(৭) Fibre glass : এটি বোরো সিলিকেট গ্লাসভুক্ত। গলিত কাচকে প্লাটিনামের সরু নলের (0.01mm–0.001mm ব্যাসবিশিষ্ট) মধ্য দিয়ে উচ্চ চাপে রাখলে সরু নমনীয় কাচের তন্তু বের হয়। একে তন্তু কাচ বলে। এটি তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী। এটি ঝালর ও পশমী বস্ত্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

(৮) Laminated Safety glass : Hard glass বা পটাশ গ্লাসের দুটি শীটের মাঝখানে স্বচ্ছ বিউটাইরেল (butyral) প্লাস্টিক অথবা ইথিলিন ভিনাইল প্লাস্টিক শীট রেখে উপযুক্ত আঠালো পদার্থসহ উচ্চ চাপে ও উচ্চ তাপমাত্রায় গলায়ে জোড়া দেয়া হয়। মোটর গাড়ির জানালার কাচ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। আঘাতে এ কাচ সহজে ভাঙ্গে না, তাই এর নাম Safety glass। কাচ ভাঙ্গলেও টুকরাগুলো প্লাস্টিক দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে।

(৯) Coloured glass বা রঙিন কাচ : সোডা গ্লাস ও পটাস গ্লাসের উপাদানের সাথে অবস্থান্তর ধাতুর অক্সাইড যেমন Cu_2O, FeO, Fe_2O_3, Cr_2O_3 অথবা NiO মিশিয়ে বিভিন্ন রঙের কাচ তৈরি করা হয়।

জেনে নাও : **(১) কাচের উপর নকশা (Etching of glass) :** কাচের ওপর মোমের আবরণ দিয়ে তার ওপর ধাতুর সরু কলম দিয়ে চিত্র অঙ্কন বা লেখা খোদাই করা হয়। খোদাই করা অংশের ওপর HF এসিড ঢেলে দিলে কাচের SiO_2 এর সাথে HF এসিড বিক্রিয়া করে দ্রবণীয় হাইড্রোফ্লোরো সিলিসিক এসিড (H_2SiF_6) উৎপন্ন করে। ফলে নকশা বরাবর কাচে গর্ত হয়ে যায়। পরে পানি দিয়ে ধুয়ে এবং মোম তুলে ফেলা হয়। কাচের ওপর এরূপ নকশা অঙ্কনকে Etching of glass বলে।

$$Na_2SiO_3 + 6HF \rightarrow 2NaF + SiF_4 + 3H_2O; \quad SiF_4 + 2HF \rightarrow H_2SiF_6$$

ব্যুরেট, পিপেট, থার্মোমিটার ইত্যাদিতে দাগ কাটা এরূপে করা হয়।

(২) বুলেট প্রুফ গ্লাস : পলি কার্বনেট নামক থার্মো প্লাস্টিক এর সাথে Laminated glass কয়েক স্তরে যুক্ত করে 0.75–3.5 ইঞ্চি (বা 19 mm – 89 mm) পুরু বিভিন্ন বুলেট প্রুফ গ্লাস তৈরি করা হয়। Laminated glass তৈরিতে স্বচ্ছ পটাস কাচের দুটি শীটের মধ্যে স্বচ্ছ ইথিলিন ভিনাইল অ্যাসিটেট শীট রেখে উপযুক্ত আঠালো পদার্থ (adhesive) সহ উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় গলায়ে জোড়া লাগানো হয়। বুলেট প্রুফ গ্লাস নিরাপত্তার স্বার্থে প্রাইভেট গাড়ি, দূতাবাসের ও বিভিন্ন বাড়ির জানালায় ব্যবহৃত হয়।

অধিক জেনে নাও : সোডা-লাইম গ্লাস বা Soft glass এর বিভিন্ন অর্ধ-তরল অবস্থায় সান্দ্রতাভিত্তিক মেকানিকেল বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম নিম্নরূপ:

Melting point of glass	:	1300°C,	Viscosity :	10^1 Poise
Working point or temp.	:	950°C – 1000°C	Viscosity :	10^3 Poise
Flow point or temp.	:	~ 900°C	Viscosity :	10^4 Poise
Softening point or temp.	:	< ~ 500°C	Viscosity :	10^{10} Poise
Annealing point or temp.	:	< ~ 500°C	Viscosity :	10^{12} Poise
Transition point or temp.	:	< ~ 500°C	Viscosity :	$10^{12} - 10^{12.6}$ Poise
Strain point or temp.	:	< ~ 500°C	Viscosity :	$10^{13.5}$ Poise

গলনাঙ্কের সংজ্ঞা : যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থের কঠিন ও তরল অবস্থা সহ-অবস্থান (co-exist) করে, তাকে ঐ পদার্থের গলনাঙ্ক বা melting point বলে। সংজ্ঞা মতে কাচের কোনো নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নেই। তাই সোডা-লাইম গ্লাসের শেষ গলনাঙ্ক যেমন 1300°C তাপমাত্রাকে গলনাঙ্ক না বলে **কাচের তরলীকরণ তাপমাত্রা বা Liquidous temp.** বলা হয়।

৫.৫.৩ সিরামিক উৎপাদনের মূলনীতি

Principle of Ceramic Production

সিরামিকের সংজ্ঞা : সিরামিক বলতে মৃৎশিল্প (pottery), টেবিল সামগ্রী (table ware), চীনামাটির বাসনপত্র (crockery), স্যানিটারি সামগ্রী (sanitary ware), ঘর সজ্জার চীনামাটির পাত্র (decorateir) ইত্যাদিকে বোঝায়।

সিরামিক উৎপাদনের উপাদানসমূহ : সিরামিক সামগ্রী উৎপাদনের প্রধান তিনটি কাঁচামাল হলো –

(১) চায়না ক্লে (কেওলিন বা কাদা মাটি) : চায়না ক্লে হলো হাইড্রেটেড অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট (Al_2O_3. $2SiO_2$. $2H_2O$)

(২) সিলিকা (কোয়ার্টজ বা ফ্লিন্ট) : SiO_2; এটি উচ্চ তাপসহ রিফ্রেকটরি দ্রব্য। ক্লে-কণাগুলোর বাইন্ডাররূপে সিলিকা কাজ করে। সিরামিকের তাপ সহনশীলতা ও যান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সিলিকা ব্যবহৃত হয়।

(৩) ফেলস্পার (felspar) : অ্যালুমিনা (Al_2O_3), সিলিকা (SiO_2) ও ক্ষারীয় অক্সাইডের মিশ্রণে গঠিত পদার্থ হলো ফেলস্পার। এটি বিগালক বা ফ্লাক্সিং পদার্থ (flux) রূপে ব্যবহৃত হয়। তিন ধরনের ফেলস্পার সিরামিক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। যেমন (i) পটাশ ফেলস্পার, $K_2O.Al_2O_3.6SiO_2$; (ii) সোডা ফেলস্পার, $Na_2O.Al_2O_3.6SiO_2$; ও (iii) লাইম ফেলস্পার, $CaO.Al_2O_3.6SiO_2$.

বিগালক : বিক্রিয়ায় মূল বিক্রিয়কের গলন তাপমাত্রাকে হ্রাস করার জন্য ব্যবহৃত পদার্থকে বিগালক বা ফ্লাক্সিং পদার্থ বলে। যেমন সিরামিক শিল্পে উচ্চ গলনাঙ্কের রিফ্রেকটরি দ্রব্য সিলিকার (SiO_2) গলন তাপমাত্রা হ্রাস করার জন্য বিগালক ফেলস্পার ব্যবহৃত হয়।

সিরামিক শিল্পে ব্যবহৃত অন্যান্য বিগালক : বোরাক্স ($Na_2B_4O_7.10H_2O$), ক্রায়োলাইট ($3NaF.AlF_3$)।

অন্যান্য রিফ্রেকটরি দ্রব্য (উচ্চ গলনাঙ্ক) : Al_2O_3, চুনাপাথর ($CaCO_3$), ম্যাগনেসাইট ($MgCO_3$), ডলোমাইট ($CaCO_3.MgCO_3$), FeO, Cr_2O_3, TiO_2 ইত্যাদি।

সিরামিক উৎপাদনের মূলনীতি : সিরামিকের মূল উপাদান চায়না ক্লে-এর সাথে বাইন্ডিং পদার্থ সিলিকা ও বিগালক পদার্থ ফেলস্পার এর আনুপাতিক গুঁড়ার মিশ্রণকে চুল্লিতে উত্তপ্ত করা হয়। তখন 600°– 650°C এর মধ্যে চায়না-ক্লে নিরুদিত হয়ে অদানাদার পদার্থ **অ্যালুমিনা** (Al_2O_3) ও **সিলিকার** (SiO_2) মিশ্রণ উৎপন্ন হয়।

এরপর 940°C তাপমাত্রায় অদানাদার অ্যালুমিনা প্রচুর তাপ উদ্‌গিরণ করে দানাদার অ্যালুমিনা গঠন করে। প্রায় 1000°C তাপমাত্রায় দানাদার অ্যালুমিনা ও সিলিকা বিগালক ফেলস্পার ($K_2O.Al_2O_3.6SiO_2$) এর উপস্থিতিতে বিগলিত হয়ে **মুলাইট** (mullite, $3Al_2O_3.2SiO_2$) গঠন করে। তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পেলে 1400°–1500°C তাপমাত্রায় অবশিষ্ট সিলিকা কেলাসিত হয়ে **ক্রিস্টোবেলাইট** (crystoballite, $4SiO_2$) গঠিত হয়। এভাবে মুলাইট ও ক্রিস্টোবেলাইটের দানাদার মিশ্রণটি উৎপন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন সচ্ছিদ্র পোড়া সিরামিক মিশ্রণটিকে 'বিস্কুট' বলে। নিম্নরূপে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে :

(i) চায়না-ক্লে নিরুদন : $\underset{\text{চায়না-ক্লে}}{Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O} \xrightarrow{650°C} \underset{\text{অ্যালুমিনা}}{Al_2O_3} + \underset{\text{সিলিকা}}{2SiO_2} + 2H_2O$

(ii) মুলাইট গঠন : $3Al_2O_3 + 4SiO_2 \xrightarrow[\text{ফেলস্পার}]{1000°C} \underset{\text{মুলাইট}}{3Al_2O_3.2SiO_2}$

(iii) ক্রিস্টোবেলাইট গঠন : $\underset{\text{সিলিকা}}{nSiO_2} \xrightarrow{1500°C} \underset{\text{ক্রিস্টোবেলাইট}}{n(4SiO_2)}$ দানাদার

সামগ্রিক সিরামিক গঠন বিক্রিয়া :

$$\underset{\text{চায়না ক্লে}}{3[Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O]} + \underset{\text{সিলিকা}}{4nSiO_2} \xrightarrow{1500°C} \underset{\text{মুলাইট}}{3Al_2O_3.2SiO_2} + \underset{\text{ক্রিস্টোবেলাইট}}{(n+1)4SiO_2} + 6H_2O$$

প্রক্রিয়া : নিম্নোক্ত ধাপে কাঁচামাল মিশ্রণ থেকে সিরামিক উৎপাদন করা হয়।

(১) স্লিপ (Slip) প্রস্তুতি : মিহিচূর্ণ চায়না-ক্লে, সিলিকা বালি ও ফেলস্পার এর নির্দিষ্ট অনুপাতের মিশ্রণে পানি যোগ করে সমসত্ত্ব তরল মিশ্রণ তৈরি করা হয়; একে স্লিপ বলে।

(২) ফিল্টার কেক্ (cake) প্রস্তুতি : স্লিপ তৈরির পর এ পর্যায়ে ফিল্টার প্রেস মেসিনে স্লিপ পদার্থ থেকে বায়ু ও অতিরিক্ত পানি দূর করে নমনীয় পদার্থে পরিণত করা হয়; একে ফিল্টার কেক্ বলে।

(৩) শেফিং ও ড্রাইয়িং (shaping, drying) : ফিল্টার কেক তৈরির পর এ পর্যায়ে ফিল্টার কেককে রোলার মিল ও ডাইস মেসিনে নির্দিষ্ট ছাঁচে প্রেরণ করে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর (যেমন কাপ, প্লেট, বাটি, জগ, মগ ইত্যাদির) আকৃতি দেয়া হয়; একে দ্রব্য সামগ্রীর Shaping বলে। এরপর কাচা দ্রব্যসামগ্রী উত্তপ্ত বায়ুর সাহায্যে সম্পূর্ণ শুষ্ক করা হয়। শুষ্ক সামগ্রীকে **ব্লাংক** (blank) বলে।

(৪) বিস্কুট ফায়ারিং ও গ্লেজিং : সচ্ছিদ্র পোড়া সিরামিক সামগ্রীকে ছিদ্র মুক্ত ও মসৃন করার জন্য শুষ্ক ব্লাংক সামগ্রীর ওপর গ্রেজিং মিশ্রণ স্প্রে করে চুল্লিতে পোড়ানো হয়। এ প্রক্রিয়াকে **'বিস্কুট ফায়ারিং'** বলে। এরূপ একধাপ-পোড়ানো (one fire process) পদ্ধতিতে বিস্কুট প্রস্তুতি ও গ্লেজিং এক সাথে করা হয়। আবার কখনও প্রথম ধাপে শুষ্ক সামগ্রীকে পোড়ায়ে বিস্কুট তৈরি এবং পরে বিস্কুটের ওপর নক্শা ও গ্লেজিং করা হয়। এরূপে সিরামিক সামগ্রী তৈরি হয়।

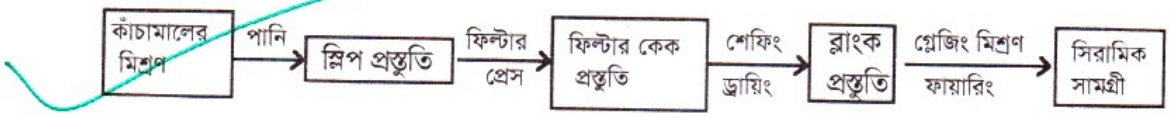

প্রবাহ চিত্র-৫.৬ : সিরামিক সামগ্রী উৎপাদনের প্রবাহ চিত্র

গ্লেজিং এর প্রয়োজনীয়তা : পোড়া কাদা মাটির তৈরি সিরামিক সামগ্রী শক্ত, ভঙ্গুর ও সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত অমসৃণ হয়। এ অবস্থায় সিরামিক সামগ্রীর গায়ে মসৃণ ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য গ্লেজিং করা হয়। গ্লেজিং করার সাধারণ glaze-মিশ্রণ হলো সিলিকা, অ্যালুমিনা ও যে কোনো একটি গ্রুপ-2 এর ধাতুর অক্সাইড (CaO/MgO); এছাড়া লেড অক্সাইড ও বোরিক অক্সাইড হতে পারে। ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3) এর উপস্থিতিতে সামগ্রী হলুদ বর্ণ এবং 0.5% কোবাল্ট অক্সাইড মিশ্রিত করলে নীল বর্ণ যুক্ত হয়। CuO দিলে সবুজ বর্ণ এবং MnO_2 দিলে বেগুনি বর্ণ যুক্ত হয়।

গ্লেজিং প্রক্রিয়া : গ্লেজিং হলো ছিদ্রযুক্ত অমসৃণ সিরামিকের ওপর **কাচ তৈরির মিশ্রণ** যেমন, সিলিকা, অ্যালুমিনা, CaO, PbO, B_2O_3 **মিশ্রণ** দিয়ে উত্তপ্ত করে গলিত কাচের পাতলা আবরণ সৃষ্টি করা। উচ্চ তাপমাত্রায় সিরামিকের ওপর NaCl ছিটিয়ে গ্লেজিং করা যায়। সিরামিক উত্তপ্তকরণের শেষ অবস্থায় NaCl ছিটিয়ে দিলে স্টিমের উপস্থিতিতে NaCl বিযোজিত হয়ে Na_2O ও HCl গ্যাস উৎপন্ন করে। তখন Na_2O সিরামিকের সিলিকা (SiO_2) এর সাথে গলিত Na_2SiO_3 তৈরি করে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে মসৃণতা সৃষ্টি করে। সিরামিকের গায়ে বিভিন্ন রঙিন চিত্রণ গ্লেজিং করার পূর্বেই করা হয়ে থাকে।

MCQ-5.5 : রঙিন কাচ তৈরিতে নিচের কোন্‌টি ব্যবহৃত হয় না?
(ক) Cu_2O (খ) FeO (গ) NiO (ঘ) MnO_2

জেনে নাও : রাসায়নিকভাবে আধুনিক উন্নত সিরামিক (modern advanced ceramics) বস্তু হলো অজৈব অক্সাইড (যেমন BeO, Al_2O_3, SiO_2), সিলিকন নাইট্রাইড (Si_3N_4), বোরন কার্বাইড (B_4C) ও সিলিকন কার্বাইড (SiC) এর দানাদার অথবা অদানাদার যৌগ। প্রস্তুতকালে বিগলন তাপমাত্রা [Al_2O_3 = 2054°C, BeO = 2578°C, B_4C = 2350°C, SiC = 2830°C, Si_3N_4 = 1900°C] থেকে শীতলকরণ ধীরে করা হলে দানাদার বা কেলাসাকার হয়; কিন্তু দ্রুত করা হলে অদানাদার গঠন হয়। সিরামিক তাপ কুপরিবাহী হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে ফার্নেস তৈরিতে এবং বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটররূপে সিরামিক ব্যবহৃত হয়।

৫.৫.৪ পাল্প-পেপার উৎপাদনের মূলনীতি
Principle of Pulp-Paper Production

পাল্প : নরম কাঠ, বাঁশ, আখের ছোবড়া প্রভৃতিকে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আঁশযুক্ত উদ্ভিদ দেহের মূল উপাদান সেলুলোজ নামক প্রাকৃতিক পলিমার ফাইবার পৃথক করা যায়; তাকে পাল্প (Pulp) বলে। এ পাল্প থেকে পেপার, টেক্সটাইল, ফুড ও ফার্মাসিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি গড়ে ওঠেছে।

বাঁশ, কাঠ, শন, খড়, পাটকাঠি, আখের ছোবড়া ইত্যাদিতে পানি ছাড়া আরো তিনটি উপাদান থাকে। যেমন,

(১) সেলুলোজ ফাইবার (আঁশ) : সেলুলোজ ফাইবার হলো ß–D গ্লুকোজের সরল শিকল প্রাকৃতিক পলিমার। সেলুলোজ পলিমারে β (1,4) গ্লাইকোসাইড বন্ধন থাকে। এটিই হলো উদ্ভিদ দেহের মূল কাঠামো উপাদান (40–45%)। এটিই পাল্প তৈরিতে আলাদা করা হয় এবং পেপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(২) লিগনিন (Lignin) : লিগনিন হলো প্রাকৃতিক ত্রিমাত্রিক পলিমার। লিগনিন সেলুলোজকে উদ্ভিদ কাঠামোতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বা বান্ডিং করে রাখে। উদ্ভিদে এটির পরিমাণ 20–30% হয়।

(৩) হেমিসেলুলোজ (hemicellulose) : হেমিসেলুলোজ হলো শাখাযুক্ত ছোট দৈর্ঘ্যের ß–D গ্লুকোজের পলিমার। উদ্ভিদে এটির পরিমাণ 35–30% হয়।

পাল্প উৎপাদন : রাসায়নিক থার্মোমেকানিকেল পাল্প (CTMP) পদ্ধতিতে লিগনিন বান্ডিং থেকে সমস্ত সেলুলোজ ফাইবারকে পৃথক করে এবং হেমিসেলুলোজকে পানিতে দ্রবণীয় ছোট অণুতে পরিণত করে ধুয়ে ফেলে পাল্প প্রস্তুত করা হয়। রাসায়নিক থার্মো মেকানিকেল পাল্প পদ্ধতি একটি মিশ্র পদ্ধতি। তিন ধরনের রাসায়নিক পদ্ধতিতে পাল্প উৎপাদন করা যায়। যেমন– (১) সালফেট পদ্ধতি বা ক্রাফট পদ্ধতি (Kraft Process), (২) সালফাইট পদ্ধতি ও (৩) সোডা-পাল্প পদ্ধতি।

কর্ণফুলি পেপার মিলে (KPM) ক্রাফ্ট বা সালফেট পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

সালফেট বা ক্রাফট পদ্ধতিতে পাল্প উৎপাদনের মূলনীতি : সালফেট পদ্ধতি হলো একটি রাসায়নিক ক্ষারীয় পদ্ধতি, এর প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও রাসায়নিক পদার্থ হলো :

(১) সেলুলোজের উৎস : ব্যালসাম জাতীয় নরম কাঠ। এতে সেলুলোজ ফাইবার বেশি থাকে; রেজিন কম থাকে।

(২) কুকিং লিকার : 27.1% Na_2S, 58.6% NaOH ও 14.3% Na_2CO_3 এর দ্রবণ।

(৩) ব্লিচিং এজেন্ট (বিরঞ্জক পদার্থ) : ক্লোরিন ডাইঅক্সাইড (ClO_2) ক্যালসিয়াম হাইপো ক্লোরাইট $Ca(OCl)_2$, O_3, H_2O_2 ইত্যাদি।

এ প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত ধাপে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে :

(১) ডাইজেস্টারে কাঁচামালের টুকরা যোগকরণ : কাঁচামালরূপে বাঁশ ও শক্ত কাঠ– যেমন, গামারি, শিমুল, কদম, কড়ই, পিত্রাজ ইত্যাদির ছোট টুকরাগুলোকে ডাইজেস্টার (digester) নামক স্টিলের বড় পাত্রে নেয়া হয়।

(২) ডাইজেস্টারে কুকিং লিকার যোগকরণ : পাইপের সাহায্যে ডাইজেস্টারে 'কুকিং লিকার' নামক 27.1% Na_2S, 58.6% NaOH, 14.3% Na_2CO_3 কঠিন পদার্থের মিশ্রণের 12% জলীয় দ্রবণ যোগ করা হয়। ডাইজেস্টারে তাপমাত্রা 170° – 176°C, চাপ 15 atm বা প্রতি বর্গইঞ্চিতে 110(Ib) থাকে। কুকিং প্রক্রিয়া কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে 30 মিনিট থেকে 5 ঘণ্টা চলে। তখন লিগনিন্ ও হেমিসেলুলোজ কুকিং লিকারে চলে আসে।

(৩) সেলুলোজ পৃথককরণ : কুকিং শেষে ছাঁকন বা ফিল্টার প্রক্রিয়ায় সেলুলোজ ফাইবার পৃথক করা হয়। বাদামি বর্ণের পরিস্রুত (filtrate) কে **'ব্ল্যাক লিকার'** বলে। এতে Na_2CO_3, Na_2SO_4 ও অন্যান্য অজৈব পদার্থ, জৈব যৌগ, লিগনিন ইত্যাদি থাকে।

(৪) ব্ল্যাক লিকারকে বিজারণ : এ পর্যায়ে ব্ল্যাক লিকারের Na_2SO_4 কে কার্বন দ্বারা বিজারিত করে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য Na_2S এ পরিণত করা হয়।

$$Na_2SO_4 + 2C \xrightarrow{\Delta} Na_2S + 2CO_2$$

(৫) সেলুলোজ ধৌতকরণ ও গাঢ়ীকরণ : পৃথক করা সেলুলোজকে ধুয়ে লিকার মুক্ত করা হয় এবং কয়েক ধাপে ছাঁকন প্রক্রিয়ায় অপরিবর্তিত ছোট কাঠের টুকরা পৃথক করে নেয়ার পর গাঢ় বাদামি সেলুলোজ পাওয়া যায়।

(৬) পাল্পের বিরঞ্জন : বর্তমানে বাদামি সেলুলোজকে ক্লোরিন ডাই অক্সাইড, ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট, ওজোন ও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দ্বারা ব্লিচিং করা হয়। এখন Cl_2 এর ব্যবহার বর্জন করা হচ্ছে। এরূপে পাল্পকে বিরঞ্জিত ও ঘনীভূত করে, শুকিয়ে, শিট আকারে বান্ডিল করে কাগজের কারখানা ও রেয়ন শিল্পে ব্যবহার করা হয়। **পাল্পের এ বান্ডেলকে ল্যাপ** (Lap) বলে।

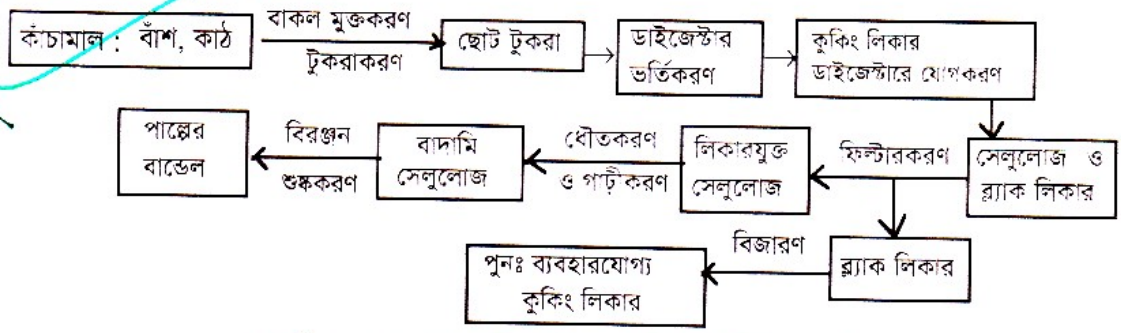

প্রবাহচিত্র ৫.৭ : সালফেট পদ্ধতিতে পাল্প উৎপাদনের প্রবাহচিত্র

পাল্প থেকে কাগজ উৎপাদনের মূলনীতি : বাঁশ ও নরম কাঠে প্রায় 40-45% সেলুলোজ, 30-35% হেমি সেলুলোজ ও 20-30% লিগনিন থাকে। সালফেট পদ্ধতিতে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হেমিসেলুলোজ ও লিগনিনকে দ্রবীভূত করে অপসারণের পর যে কাই পাওয়া যায় তাকে কাগজের মণ্ড বা পাল্প বলে। এ পাল্পকে পর্যায়ক্রমে পাল্প বিটারে সাইজিং এজেন্ট যোগ করে বিটিং, এরপর ফিলার মিশিয়ে রিফাইনিং এবং ব্লিচিং এজেন্ট যোগ করে রোলার মেশিনে শীট তৈরি পদ্ধতিতে পানি রোধী, উজ্জ্বল সাদা ও মসৃন কাগজের শীট উৎপাদন করা হয়।

পাল্প থেকে কাগজ তৈরি :

পাল্প বা মণ্ড থেকে নিম্নোক্ত তিন ধাপে কাগজ তৈরি হয়। যেমন, (১) বিটিং, (২) রিফাইনিং ও (৩) কাগজ শীট তৈরি।

(১) বিটিং (beating) : স্টিলের তৈরি গোলাকার **পাল্প-বিটারে** পানিতে পাল্প মিশিয়ে আলোড়িত করলে তরল পাল্প মিশ্রণ তৈরি হয়। এটিকে ফিল্টার করে ময়লা ও বড় আকারের তন্তু অপসারণ করা হয়। এরপর উত্তপ্ত করে পানি দূর করলে পাল্প পেস্ট তৈরি হয়। এর মধ্যে প্রয়োজনমতো রং ও **সাইজিং এজেন্ট** (Sizing agent) রূপে রেজিন (resin) ও ফিটকিরি মিশানো হয়। এটি পাল্পের আঁশগুলোকে আঠালো জিলেটিনে আবদ্ধ করে মণ্ডকে শক্ত ও ঘন করে। চোষ কাগজ (Soaking Paper) তৈরিতে সাইজিং এজেন্ট ব্যবহৃত হয় না।

(২) রিফাইনিং (Refining) : বিটিং করা পাল্প মিশ্রণকে রিফাইনার মেসিন 'জর্ডান ইঞ্জিনে' যোগ করা হয়। এ মেসিনে ঘূর্ণায়মান দাঁতযুক্ত দুটি প্লেট থাকে। এখন বিটিং করা মিশ্রণে **ফিলার** (filler) রূপে টেলক ($3MgO.4SiO_2.H_2O$), অধঃক্ষিপ্ত $CaCO_3$ গুঁড়া, TiO_2 ইত্যাদি এবং বিরঞ্জকরূপে ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট $Ca(OCl)_2$ যোগ করে 'জর্ডান রিফাইনার' মেশিনে চালনা করলে ঘূর্ণায়মান দুই দাঁতযুক্ত প্লেটের পেষণের পর সেলুলোজ আঁশগুলো নরম হয়। ঐ নরম সেলুলোজ আঁশের ফাঁকগুলো ফিলার দ্বারা পূর্ণ হয়ে মসৃণ সাদা পাল্প তৈরি হয়।

(৩) কাগজের শীট তৈরি : রিফাইনিং করা মসৃণ পাল্পকে 'ফোরড্রিনিয়ার' মেশিনে ... রোলারের মাঝখানে চাপ দিয়ে পাতলা শীটে রূপান্তর করা হয়। এ মেশিনে কাগজের শীট তৈরি ...

(i) ঘূর্ণায়মান দুই রোলারের মাঝখানে গাঢ় পাল্পকে চাপ দিয়ে পাতলা শীটে পরিণতকরণ,

(ii) ভেজা কাগজের শীটকে ফেল্ট ব্ল্যাংকেট রোলারে চালনা করে পানি অপসারণ,

(iii) এরপর উত্তপ্ত ফেল্ট ব্ল্যাংকেট রোলারের ওপর কাগজের শীটকে 90–95% শুষ্ককরণ, এবং

(iv) সব শেষে প্রয়োজনমতো সাইজিং এজেন্ট ছিটিয়ে ক্যালেন্ডারিং করে মসৃণ কাগজ শীট তৈরি করা হয়।

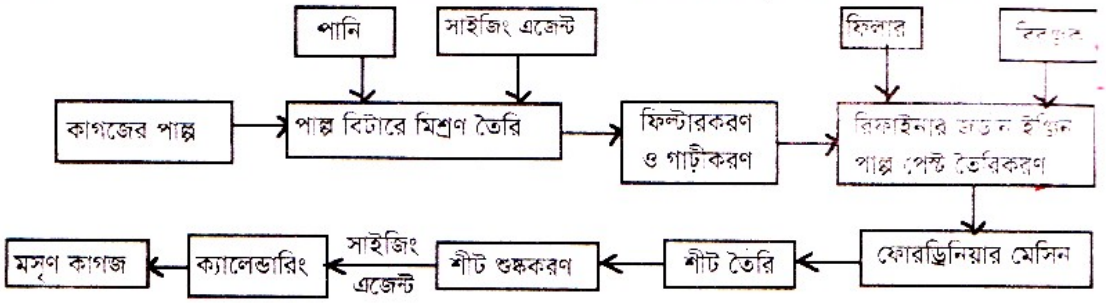

প্রবাহ চিত্র ৫.৮ : কাগজের পাল্প বা মণ্ড থেকে কাগজ উৎপাদনের প্রবাহ চিত্র

MCQ-5.6 : সেলুলোজ থেকে লিগনিন ও হেমি সেলুলোজ পৃথক করতে ডাইজেস্টারে ব্যবহৃত হয় :

(i) কুকিং লিকাররূপে 27.1% Na_2S, 58. 6%NaOH, 14.3% $NaClO_3$ এর জলীয় দ্রবণ;

(ii) 175°C তাপমাত্রায় (iii) 15 atm. চাপ

নিচের কোনটি সঠিক হবে?

(ক) (i) ও (ii) (খ) (ii) ও (iii) (গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

৫.৫.৫ সিমেন্ট উৎপাদনের মূলনীতি
Principle of Cement Production

সিমেন্টের পরিচিতি : সিমেন্ট বলতে সিলিকা, অ্যালুমিনা, চুন ইত্যাদির গুঁড়ার মিশ্রণকে বোঝায়। তিনটি রাসায়নিক পদার্থের এ গুঁড়া মিশ্রণটি পানিতে মিশে প্রথমে কাদার মতো নমনীয় থাকে। পরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জমাট বেঁধে শক্ত কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়। বর্তমানে চার শ্রেণির সিমেন্ট উৎপাদিত হয়। যেমন, (১) পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট (২) পজুওলানা সিমেন্ট, (৩) ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট সিমেন্ট, (৪) ক্ষয়রোধকারী সিমেন্ট। তবে বাংলাদেশে উৎপাদিত সিমেন্ট পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট (Portland Cement) শ্রেণিভুক্ত।

পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের সংজ্ঞা : বিভিন্ন সংযুক্তির ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট ও ক্যালসিয়াম সিলিকেটের মিহি চূর্ণের মিশ্রণ, যা পানির উপস্থিতিতে জমাট বেঁধে দৃঢ় ও শক্ত কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, তাকে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট বলে। জমাট বাঁধা এ কঠিন পদার্থ ইংল্যান্ডের পোর্টল্যান্ড নামক স্থানে পাওয়া এক ধরনের শক্ত পাথরের মতো হওয়ায় এরূপ নামকরণ হয়েছে। পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট পানির উপস্থিতিতে জমাট বেঁধে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, তাই একে **হাইড্রলিক** (Hydraulic) **সিমেন্ট**ও বলে।

পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের সংযুক্তি : পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের মোটামুটি সংযুক্তি নিম্নরূপ :

(১) চুন (CaO)	= 60 – 70%	(৪) ম্যাগনেসিয়া (MgO)	= 1 – 4%
(২) সিলিকা (SiO_2)	= 20 – 24%	(৫) আয়রন অক্সাইড	= 2.5%
(৩) অ্যালুমিনা (Al_2O_3)	= 3 – 8%	(৬) সালফার ট্রাইঅক্সাইড (SO_3)	= 1.5%

অত্যাবশ্যক উপাদান **ক্যালকেরিয়াস** বা Ca ধাতু ঘটিত পদার্থ হলো চুন বা লাইম, এটি চুনাপাথর থেকে পাওয়া যায়। কাদা মাটি বা **আরজেলেসিয়াস পদার্থ**রূপে সিলিকা, অ্যালুমিনা, MgO, আয়রন অক্সাইড, চায়না ক্লে থেকে পাওয়া যায়। নিচের উপাদানভিত্তিক অনুপাত সিমেন্টে বজায় রাখা হয়।

$$\frac{\text{সিলিকা } (SiO_2)}{\text{অ্যালুমিনা } (Al_2O_3)} = 2.5 - 4; \quad \frac{CaO \text{ এর শতকরা পরিমাণ}}{(\%\ SiO_2 + \%\ Al_2O_3 + \%\ Fe_2O_3)} = 1.9 - 2.1$$

পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের সংযুক্তির বৈশিষ্ট্য :

(i) আয়রনমুক্ত সিমেন্ট সাদা হয়, কিন্তু উপাদান মিশ্রণের তাপজারণ দেরি হয়।

(ii) চুন কম থাকলে সিমেন্ট তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধে; কিন্তু কম শক্ত (strength) থাকে। আবার চুনের % পরিমাণ (1.9–2.1এর) বেশি হলে, সিমেন্টে ফাটল সৃষ্টি করে।

(iii) সিলিকার অনুপাত কম হলে ধীরে ধীরে জমাট বাঁধে।

(iv) অ্যালুমিনার শতকরা পরিমাণ বেশি হলে সিমেন্ট খুব তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধে।

MCQ- 5.7 : মণ্ড থেকে কাগজ তৈরির ধাপগুলো হলো–
(i) বিটিং (ii) রিফাইনিং
(iii) শীট তৈরি
কোনটি সঠিক হবে?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

* **পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের গুঁড়ায় চারটি মূল উপাদান থাকে**। যেমন,

(১) প্রধানতম উপাদান ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেট, C_3S (50%) : $3CaO.SiO_2$

(২) দ্বিতীয় উপাদান ডাইক্যালসিয়াম সিলিকেট, C_2S (25%) : $2CaO.SiO_2$

(৩) তৃতীয় উপাদান ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট C_3A(10%): $3CaO.Al_2O_3$

(৪) চতুর্থ টেট্রাক্যালসিয়াম অ্যালুমিনো ফেরাইট, C_4AF (10%) : $4CaO.Al_2O_3.Fe_2O_3$

পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট উৎপাদনের মূলনীতি : সিমেন্টের প্রধান উপাদান **ক্যালকেরিয়াস** বা ক্যালসিয়াম ঘটিত পদার্থ হলো চুনাপাথর, মার্বেল পাথর, শিল্প-উপজাত $CaCO_3$ থেকে উৎপন্ন পোড়া চুন বা লাইম (CaO)। আর কাদামাটি জাতীয় বা **আরজেলেসিয়াস** পদার্থ হলো চায়না ক্লে, বাত্যাচুল্লি হতে প্রাপ্ত ধাতুমল, আগ্নেয়গিরিজাত পদার্থ (লাভা), শ্লেট জাতীয় পদার্থ, ঝিনুকের খোল ইত্যাদি। এগুলো ভস্মীকরণে সিলিকা, অ্যালুমিনা ও Fe_2O_3 পাওয়া যায়। এ দুই শ্রেণির পদার্থের ভস্মীকরণে প্রাপ্ত ছোট আকারের শক্ত পাথর টুকরাকে **সিমেন্টের নুড়ি** বা **ক্লিংকার** বলে। এ ক্লিংকারের মিহিচূর্ণের সাথে 2–3% পরিমাণে জিপসাম ($CaSO_4.2H_2O$) এর মিহিচূর্ণ মিশিয়ে **পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট** উৎপাদন করা হয়।

পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট উৎপাদন পদ্ধতি : পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট উৎপাদন তিনটি স্তরে সম্পন্ন হয়। যেমন

(১) কাঁচামালের গুড়ার মিশ্রণ তৈরি,

(২) ভস্মীকরণ প্রক্রিয়ায় ক্লিংকার উৎপাদন ও

(৩) ক্লিংকারের মিহিচূর্ণ ও জিপসামের মিহি চূর্ণ মিশিয়ে সিমেন্ট তৈরি।

প্রাথমিক কাঁচামালের গুঁড়ার মিশ্রণ তৈরি করার দুটি পদ্ধতি আছে। যেমন **সিক্ত (wet) পদ্ধতি** [এক্ষেত্রে জ্বালানি খরচ কম) ও **শুষ্ক (dry) পদ্ধতি** (এক্ষেত্রে জ্বালানি খরচ বেশি)।

(১) **কাঁচামালের মিশ্রণ তৈরি :**

* **সিক্ত পদ্ধতি** : ক্যালকেরিয়াস বা ক্যালসিয়াম ঘটিত কাঁচামাল যেমন চুনাপাথরকে প্রথমে 'আবর্তক গুঁড়াকরণ যন্ত্রে' (Gyratory Crusher-এ) ও পরে বল (ball) মিলের সাহায্যে মিহিচূর্ণ করে ঐ চূর্ণকে **ওয়াশ মিল** (wash mill) যন্ত্রে পানি প্রবাহে ধুয়ে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দূর করা হয়। এর মধ্যে আরজেলেসিয়াস পদার্থ চায়না-ক্লে প্রয়োজন মতো যোগ করে মিশ্রণটিকে **'বল মিল'** এ মিহিচূর্ণ করে উত্তমরূপে মেশানো হয়। এ মিশ্রণকে **স্লারি** (slurry) বলে।

* **শুষ্ক পদ্ধতি** : এ পদ্ধতিতে ক্যালসিয়াম জাতীয় ও আরজেলেসিয়াস জাতীয় কাঁচামালকে পৃথকভাবে ঘূর্ণায়মান চূর্ণীকরণ যন্ত্রে ও বল মিল যন্ত্রে মিহিচূর্ণে পরিণত করা হয়। এরপর উভয় শ্রেণির চূর্ণ উপাদানগুলোকে উপযুক্ত পরিমাণে নিয়ে **'মিক্সিং মিল'**–এ যোগ করে সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এ মিশ্রণটিকে **'র-মিল'** (raw mill) বলে।

কাঁচামালের মিশ্রণের ভস্মীকরণ : ভস্মীকরণ প্রক্রিয়াটি হলো একটি তাপ-বিয়োজন পদ্ধতি। একটি স্টিল নির্মিত ঘূর্ণায়মান চুল্লিতে কাঁচামালের মিশ্রণকে ভস্মীকরণ করা হয়। চুল্লিটির ভেতরের দেয়ালে অগ্নিসহ মৃত্তিকার প্রলেপ দেয়া থাকে। চুল্লিটিকে সামান্য আনতভাবে রেখে বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে ঘোরানো হয়। সিক্ত পদ্ধতির কাঁচামালের স্লারি মিশ্রণকে (অথবা শুষ্ক পদ্ধতির 'র-মিল' মিশ্রণকে) চুল্লির উপরি ভাগের 'হফার'-এর মাধ্যমে চুল্লিতে যোগ করা হয়। জ্বালানির (কয়লা) সাহায্যে চুল্লিটির নিচের দিকে উত্তপ্ত করা হয়। তাই চুল্লির নিচের অংশে 1500°C এবং ওপরের অংশে 800°–750°C তাপমাত্রা থাকে। চুল্লিটিকে ঘোরাতে থাকলে কাঁচামালের মিশ্রণ ওলট-পালট হয়ে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে থাকে এবং চুল্লির উচ্চতম তাপমাত্রা অঞ্চলে পৌঁছে। তখন ভস্মীকরণ সম্পন্ন হয়ে বিগলিত ক্যালসিয়াম সিলিকেট, ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট ও ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনো ফেরাইট মিশ্রিত **সিমেন্ট নুড়ি বা ক্লিংকার** উৎপন্ন হয়।

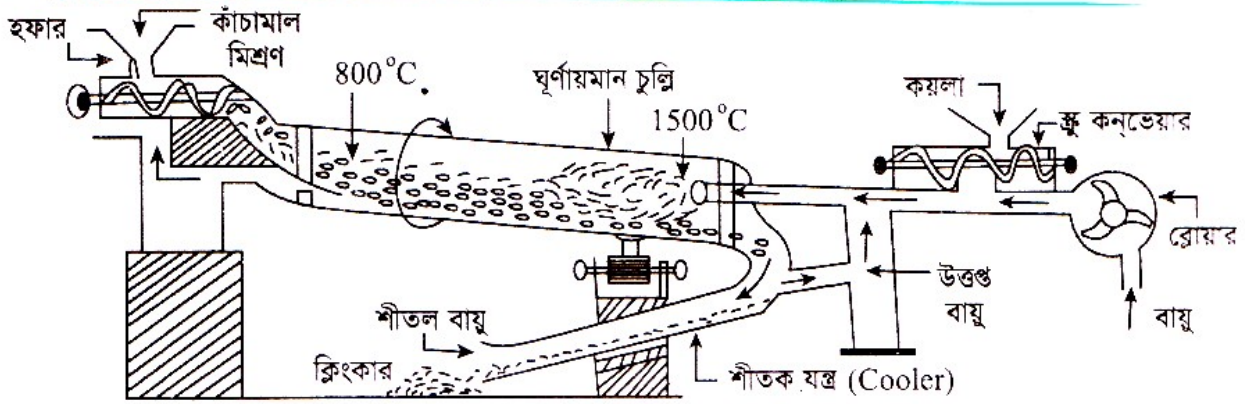

প্রবাহচিত্র ৫.৯ : ঘূর্ণায়মান চুল্লিতে সিমেন্ট ক্লিংকার উৎপাদন

সিমেন্ট উৎপাদনে ঘূর্ণায়মান চুল্লিতে তাপমাত্রা অনুসারে সংঘটিত বিক্রিয়াসমূহ :

(i) চুল্লির উপরিভাগে প্রায় 800°C তাপমাত্রায় স্লারি মিশ্রণের সমস্ত পানি বাষ্পীভূত হয়ে চুল্লি থেকে নির্গত হয়।

(ii) চুল্লির মধ্যভাগে 1000°C তাপমাত্রায় চুনাপাথর ($CaCO_3$) বিয়োজিত হয়ে লাইম (CaO) ও CO_2 উৎপন্ন হয়।

$$CaCO_3 \xrightarrow{1000°C} CaO + CO_2$$

(iii) চুল্লির নিম্নভাগে 1400°–1500°C তাপমাত্রায় লাইম (CaO) ও চায়না ক্লে এর উপাদানগুলো পরস্পর বিক্রিয়া করে– (১) ডাইক্যালসিয়াম সিলিকেট ($2CaO.SiO_2$), (২) ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট ($3CaO.SiO_2$),

(৩) ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট ($3CaO.Al_2O_3$) ও (৪) টেট্রাক্যালসিয়াম অ্যালুমিনো ফেরাইট ($4CaO.Al_2O_3.Fe_2O_3$) উৎপন্ন করে। এ পদার্থগুলো ধূসর বর্ণের সিমেন্ট নুড়ি বা সিমেন্ট ক্লিংকার তৈরি করে।

$$2CaO + SiO_2 \xrightarrow{1450°C} 2CaO.SiO_2 \quad \text{(ডাইক্যালসিয়াম সিলিকেট)}$$

$$3CaO + SiO_2 \xrightarrow{1450°C} 3CaO.SiO_2 \quad \text{(ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট)}$$

$$3CaO + Al_2O_3 \xrightarrow{1450°C} 3CaO.Al_2O_3 \quad \text{(ট্রাই ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট)}$$

$$4CaO + Al_2O_3 + Fe_2O_3 \xrightarrow{1450°C} 4CaO.Al_2O_3.Fe_2O_3 \quad \text{(টেট্রা ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনো ফেরাইট)}$$

সিমেন্ট ক্লিংকার

(৩) ক্লিংকার ও জিপসামের মিহিচূর্ণ মিশ্রণ তৈরি : ক্লিংকারের নুড়িগুলো ঘূর্ণায়মান চুল্লির শীতক যন্ত্রে শীতল বায়ু প্রবাহে শীতল হয়ে চুল্লির নিচে জমা হয়। এরপর নুড়িগুলোকে **'বল-মিল'** যন্ত্রে মিহিচূর্ণ করা হয়। এ মিহিচূর্ণের সাথে 2–3% জিপ্‌সাম ($CaSO_4.2H_2O$) এর মিহি চূর্ণ মিশিয়ে সিমেন্ট–মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এরূপে প্রস্তুত করা সিমেন্ট মিশ্রণকে বস্তাবন্দী করে বাজারজাত করা হয়।

জিপসাম গুঁড়া মিশানোর কারণ হলো ক্লিংকার গুঁড়ায় উপস্থিত ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট ($3CaO.Al_2O_3$) পানির সংস্পর্শে দ্রুত জমাট বাঁধে এবং পরে ফেঁটে যায়। জিপসাম গুঁড়া ট্রাই ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট–এর সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম সালফো অ্যালুমিনেট উৎপন্ন করে এবং সিমেন্টের জমাট বাঁধা প্রক্রিয়াকে মন্থর করে। ফলে সিমেন্টের জমাট বাঁধার পর ফাটল রোধ হয়।

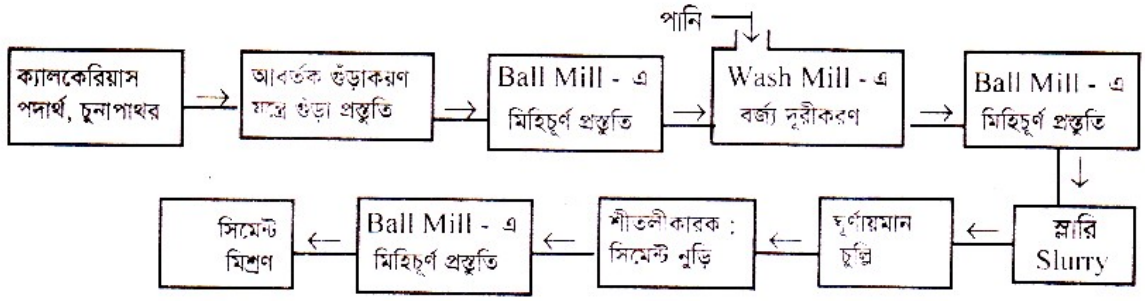

প্রবাহচিত্র ৫.১০ : সিক্ত পদ্ধতিতে সিমেন্ট উৎপাদন

সিমেন্টের জমাট বাঁধা (Setting of Cement) : সিমেন্টে পানি মিশালে সিমেন্টের উপাদানসমূহের মধ্যে **আর্দ্র বিশ্লেষণ** (hydrolysis) দ্বারা $Ca(OH)_2$ ও $Al(OH)_3$ এর সূক্ষ্ম কেলাস তৈরি হয় এবং **পানি–যোজন** (hydration) দ্বারা ডাইক্যালসিয়াম সিলিকেট ও ট্রাই ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেটের কলয়েড জেল সদৃশ সূক্ষ্ম কেলাস গঠিত হয়। এ সব সূক্ষ্ম কেলাস ধীরে জমাট বেঁধে কঠিন শক্ত বস্তুতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াকে **সিমেন্টের জমাট বাঁধা** বা Setting of Cement বলে।

(i) আর্দ্র বিশ্লেষণ দ্বারা ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেট ও ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট আংশিকভাবে $Ca(OH)_2$ ও $Al(OH)_3$ এর কেলাস তৈরি করে। যেমন,

$$3CaO.SiO_2 + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + 2CaO.SiO_2$$

$$3CaO.Al_2O_3 + 6H_2O \rightarrow 3Ca(OH)_2 + 2Al(OH)_3$$

(ii) পানি–যোজন দ্বারা ডাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট ও ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট এদের কলয়েড জেল তৈরি করে। যেমন,

$$2CaO.SiO_2 + x\ H_2O \rightarrow 2CaO.SiO_2.\ x\ H_2O \quad [\text{কলয়েড জেল}]$$

$$3CaO.Al_2O_3 + 6\ H_2O \rightarrow 3CaO.Al_2O_3.6\ H_2O \quad [\text{কলয়েড জেল}]$$

(iii) সিমেন্ট সেটিং-এ জিপসামের ভূমিকা : সিমেন্টের উপাদান ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট ($3CaO.Al_2O_3$) সিমেন্ট জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। কিন্তু জিপসাম ($CaSO_4.2H_2O$) ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেটের সাথে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম সালফো অ্যালুমিনেট তৈরি করে। ফলে সিমেন্টের দ্রুত জমাট বাঁধা প্রক্রিয়াটি ধীরে চলে এবং উৎপন্ন কঠিন পদার্থের দৃঢ়তা শক্তি বেড়ে যায়। সুতরাং **সিমেন্টের জমাট বাঁধা প্রক্রিয়াকে মন্থর করা জিপসামের কাজ।**

$$3CaO.Al_2O_3 + 3(CaSO_4.2H_2O) + 2\ H_2O \rightarrow 3CaO.Al_2O_3.3CaSO_4.2H_2O + 6H_2O$$

MCQ-5.8 : সিলিকা উপাদানটি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে-
(i) সিমেন্ট উৎপাদনে, (ii) সিরামিক শিল্পে, (iii) গ্লাস উৎপাদনে,
কোনটি সঠিক হবে?
(ক) (i) ও (ii) (খ) (ii) ও (iii) (গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

৫.৬ চামড়া টেনিং-এর মূলনীতি
Principle of Leather Tanning

টেনিং এর সংজ্ঞা : পশুর কাঁচা চামড়াকে রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত করে অধিকতর স্থিত ও বিয়োজন রোধক চামড়া বা লেদার (Leather) এ পরিণত করার প্রক্রিয়াকে **চামড়া টেনিং** বলে। এ টেনিং প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক অবস্থায় ট্যানিন (Tannin) নামক এক উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়েছিল; এ শব্দ থেকেই টেনিং নামকরণ হয়েছে। যে স্থানে টেনিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সে কারখানাকে 'ট্যানারি' বলে।

ট্যানারিতে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণকে প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়। যেমন,

(ক) প্রি-টেনিং বা বীম হাউজ প্রক্রিয়াকরণ ও

(খ) টেনিং প্রক্রিয়াকরণ

(ক) প্রি-টেনিং বা বীম হাউজ প্রক্রিয়াকরণ : পশুর চামড়ায় সাধারণত 85% কোলাজেন ফাইবার (প্রোটিন) এবং অবশিষ্ট পরিমাণ অ্যালবুমিন, গ্লোবলিন, লিপিড ও কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ থাকে। প্রি-টেনিং প্রক্রিয়াকালে চামড়ার মূল উপাদান কোলাজেন প্রোটিনকে অন্যান্য উপাদান থেকে রাসায়নিকভাবে পৃথক করা হয়। এটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয় এরপর টেনিং প্রক্রিয়াকরণে ঐ চামড়া ব্যবহৃত হয়। প্রি-টেনিং প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপগুলো নিম্নরূপ :

(১) কিউরিং (Curing) : চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু করতে কয়েকদিন লেগে যায়। ঐ সময়ে চামড়ার প্রোটিনে যেন ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে না পারে, সে জন্য **কিউরিং** করা হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাদ্য লবণ (NaCl) দ্বারা কিউরিং করার মাধ্যমে কাঁচা চামড়া হতে যথাসম্ভব পানি বের করা হয়। কিউরিং দু'পদ্ধতিতে করা যায়। যেমন,

আর্দ্র-লবণায়ন কিউরিং ও ব্রাইন কিউরিং। আর্দ্র-লবণায়ন (wet-salting) পদ্ধতিতে চামড়ার ওপর বেশি পরিমাণ লবণ ছড়িয়ে দিয়ে একটি চামড়ার ওপর আরেকটি চামড়া লবণসহ এভাবে রেখে চাপ দিয়ে প্রায় ৩০ দিন প্যাকিং করা হয়।

ব্রাইন বা সম্পৃক্ত লবণ-পানি কিউরিং পদ্ধতিতে চামড়াকে গাঢ় লবণের দ্রবণে (26.4% NaCl দ্রবণে) রেখে প্রায় ১৬ ঘণ্টা নাড়ানো হয়।

(২) সোকিং বা পানিতে ভিজানো : কিউরিং এর পর ট্যানারিতে লবণযুক্ত চামড়াকে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে লবণ মুক্ত করা হয়। চামড়া থেকে পশুর রক্ত মুক্ত হয়। পশুর রক্ত থাকলে টেনিং করা চামড়ায় আয়রনের দাগ পড়ে। কিউরিংকালে চামড়া থেকে মুক্ত পানি soaking এর বেলায় আবার যুক্ত হয়, ফলে কোলাজেন ফাইবার স্বাভাবিক হয়। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত পানি ব্যাকটেরিয়া মুক্ত রাখা হয়। তখন চামড়া 'পানি-ভিজানো' অবস্থায় থাকে।

(৩) লাইমিং বা চুন সংযোগকরণ (Liming) : পানিতে ভিজানো চামড়াকে পরে চুনের পানিতে রাখা হয়। তখন কোলাজেনের পেপটাইড বন্ধন (–CO–NH–) এ ক্ষারীয় আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটে। ফলে প্রোটিন শিকলের এক প্রান্তে $-\overset{+}{N}H_3$ মূলক ও অপর প্রান্তে কার্বক্সিলেট আয়ন ($-COO^-$) থাকে।

এরপর চামড়ার লোম, চর্বি, গ্রীজ ও কেরাটিনাস্ পদার্থ দূর করতে কিছু শার্পেনিং এজেন্ট (sharpening) যোগ করা হয়। শার্পেনিং এজেন্টসমূহ হলো সোডিয়াম সালফাইড (Na_2S), সোডিয়াম সায়ানাইড (NaCN) ও জৈব অ্যামিনসমূহ।

লোম বা চুলের দৃঢ়তার মূল কারণ হলো সিস্টিন (cystein) নামক অ্যামাইনো এসিডের মাধ্যমে আন্তঃপ্রোটিন শিকলে ডাইসালফাইড (S–S) বন্ধন সৃষ্টি। শার্পেনিং এজেন্টগুলো এ ডাইসালফাইড (S–S) বন্ধন ভেঙ্গে দেয়; প্রোটিনের পলিপেপ্টাইড শিকল আলাদা হয়ে পড়ে। চুন ও শার্পেনিং এজেন্ট দ্বারা চামড়া থেকে পশুর লোম ছাড়ানো সহজ হয়। এ প্রক্রিয়ার ফলে–

(i) লোম ও অন্যান্য কেরাটিনাস্ পদার্থসমূহ দূর হয়।

(ii) প্রোটিনের আন্তঃফাইবারের মধ্যে থাকা বন্ধনসমূহ দুর্বল হয়। দ্রবণীয় প্রোটিন কিছুটা পানিতে মিশে দূর হয়।

(iii) তখন ফাইবারসমূহ দূরে সরে যায়।

(iv) চামড়া থেকে চর্বি ও গ্রীজ দূর হয়।

(v) চামড়ার প্রোটিন শিকল বা কোলাজেন (collagen)-কে টেনিং উপযুক্ত করা হয়।

(৪) লোম দূরীকরণ : চুন সংযোগ ধাপে কিছু পরিমাণ লোম দূর হয়। তাই লোম পুরোপুরি দূর করতে চামড়ার সাথে সোডিয়াম সালফাইড, NaOH, সোডিয়াম সালফাইট (Na_2SO_3), ক্যালসিয়াম হাইড্রোসালফাইড $Ca(HS)_2$ ও ডাইমিথাইল অ্যামিন $(CH_3)_2NH$ মিশ্রণ যোগ করা হয়। এরপর মেসিন দ্বারা ও পরে হাতের সাহায্যে ভোঁতা ছুরি দিয়ে লোম দূর করা হয়।

(৫) চুন দূরীকরণ (Deliming) : লোম দূরীকরণের পর এ পর্যায়ে চামড়াকে NH_4Cl অথবা $(NH_4)_2SO_4$ লবণের দ্রবণ দ্বারা লাইম মুক্ত করা হয়। শেষে ধৌত করে ট্যানিং এর উপযুক্ত করা হয়।

(৬) বেটিং : চুন বা লাইম মুক্ত চামড়াকে বেটিং এজেন্ট মিশ্রণে ডুবানো হয়। বেটিং এজেন্ট হলো প্রোটিওলাইটিং এনজাইম ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিনের মিশ্রণ। এ বেটিং মিশ্রণ চামড়ায় থাকা সব প্রোটিনকে আর্দ্র বিশ্লেষিত করে দূর করে। এ প্রক্রিয়ায় চামড়ার স্ফীতিকরণ ও p^H মান হ্রাস পায়; চামড়ার মসৃণতা বৃদ্ধি পায়।

(৭) পিকলিং (Pickling) : চামড়াকে খনিজ টেনিং (mineral tanning) করার আগে চামড়াকে লবণ ও 1.5% সালফিউরিক এসিডের মিশ্রিত জলীয় দ্রবণে ডুবানো হয়। তখন কোলাজেনের pH খুবই কমে যায় এবং খনিজ টেনিং–এর এজেন্টসমূহ সহজে চামড়ার ভেতর প্রবেশ করতে পারে। এ প্রক্রিয়াকে **পিকলিং** বলে। পিকলিং এর ফলে চামড়ার প্রোটিনের Ca লবণ $CaSO_4$ রূপে অপসারিত হয় এবং প্রোটিনের মধ্যে লিংকেজ সৃষ্টি করে চামড়াকে ক্রোম টেনিং এর উপযোগী করে তোলে। ক্রোম টেনিং এর pH হলো 3.0। এসিডের তুলনায় লবণ প্রায় দ্বিগুণ গতিতে চামড়ার ভেতর প্রবেশ করে এবং আবশ্যিক pH কমানোর কোনো খারাপ প্রভাব থাকলে, তা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

$$\updownarrow -NH_2-Ca-OOC- \updownarrow + H_2SO_4 \longrightarrow \updownarrow \overset{+}{N}H_3 \text{ লবণ লিংকেজ } \bar{O}OC- \updownarrow + CaSO_4$$

এখানে খাড়া উভমুখী তীর চিহ্ন ($\updownarrow$) দ্বারা প্রোটিন শিকল বা কোলাজেনকে বোঝানো হয়েছে।

(খ) টেনিং প্রক্রিয়াকরণ : কাঁচা চামড়াকে পাকা চামড়ায় পরিণত করার জন্য টেনিং প্রক্রিয়াকরণ প্রয়োজন হয়। টেনিং দুই প্রক্রিয়ায় করা হয়।

(১) খনিজ টেনিং বা ক্রোম টেনিং ও

(২) উদ্ভিজ্জ টেনিং

ক্রোম টেনিং সংজ্ঞা : কাঁচা চামড়াকে পাকা চামড়া বা লেদারে পরিণত করার কালে পিকলিং ধাপের পর পলিপেপটাইড বা কোলাজেনের পেপটাইড বন্ধন (–CONH–) এর মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে Cr^{3+} আয়ন দ্বারা কোলাজেন ফাইবারগুলোকে কোলাজেন-ক্রোমিয়াম-অক্সো জটিল যৌগে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে ক্রোম টেনিং বলে। এতে এনজাইম ট্রিপসিনের আর্দ্র বিশ্লেষণ ক্রিয়া ঘটতে পারে না বলে চামড়া পচন বিয়োজন থেকে মুক্ত থাকে।

ক্রোম টেনিং এর মূলনীতি : আধুনিক কালে ক্রোমিয়াম (III) সালফেট $Cr_2(SO_4)_3$ লবণের দ্রবণে $NaHCO_3$ যোগ করে দ্রবণের p^H 3 থেকে বৃদ্ধি করে 4.0–4.3 এর মধ্যে রাখা হয়। ঐ দ্রবণে ক্রোমিয়াম লবণ দ্রবীভূত হয়ে হেক্সা অ্যাকুয়া ক্রোমিয়াম (III) ক্যাটায়ন $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ তৈরি হয়। দ্রবণের p^H বৃদ্ধির ফলে ঐ ক্যাটায়ন পলি ক্রোমিয়াম (III)

জটিল যৌগ গঠন করে। এটি চামড়ার বিভিন্ন কোলাজেন শিকলের মধ্যে ক্রস সংযোগ এজেন্টরূপে কাজ করে। তখন দুটি কোলাজেন শিকলের একটির $-\ddot{N}H_2$ মূলকের সাথে প্রতিটি Cr^{3+} আয়ন এর সন্নিবেশ যোজ্যতা দ্বারা যুক্ত হয়। এছাড়া দ্বিতীয় কোলোজেন শিকলের কার্বক্সিলেট আয়ন ($-COO^-$) এর সাথে ঐ Cr^{3+} আয়নের প্রাইমারি যোজ্যতা দ্বারা যুক্ত হয়ে দুটি কোলাজেন শিকলের মধ্যে লবণ লিংকেজ দ্বারা একটি ক্রস সংযোগ সৃষ্টি করে। এরূপে বহু সংখ্যক Cr^{3+} আয়ন O পরমাণুর সাথে এদের প্রত্যেকের অবশিষ্ট দুটি প্রাইমারি যোজ্যতা দ্বারা ক্রোমিয়াম অক্সিজেন ($-O-Cr-O-Cr-$) দীর্ঘ শিকল সৃষ্টি করে কোলাজেন-ক্রোমিয়াম অক্সো জটিল যৌগ গঠন করে। তখন পিকলিং ধাপে দুটি কোলাজেনের মধ্যে সৃষ্ট লিংকেজগুলো পূর্ণ করে দেয়। চিত্রে তা দেখানো হলো :

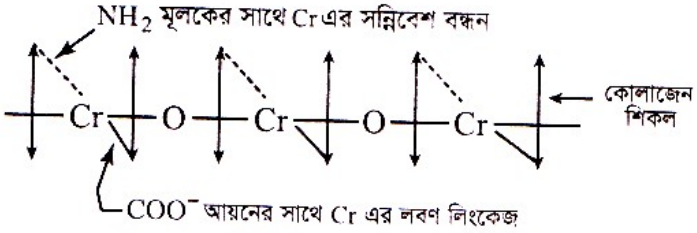

চিত্র-৫.১১ : কোলাজেন ক্রোমিয়াম অক্সো জটিল গঠন

(i) ক্রোম টেনিং প্রক্রিয়া : ক্রোম টেনিং ড্রামে ক্রোমিয়াম (III) সালফেট দ্রবণ প্রয়োজন মতো নেয়া হয়। এ দ্রবণে $NaHCO_3$ যোগ করে দ্রবণের pH মান 4.0–4.3 এর মধ্যে রাখা হয়। এ ক্রোম টেনিং মিশ্রণে পিকলিং করা কাঁচা চামড়াকে ছয় ঘণ্টা যাবৎ ভিজিয়ে রাখা হয়। ক্রোম টেনিং শেষে লেদারকে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়। এরপর লেদার ফিনিশিং করা হয়।

(ii) লেদার ফিনিশিং : লেদার ফিনিশিং ধাপে লেদারকে রং করা, [রং করার জন্যে চামড়াকে প্রথমে ব্লিচিং এজেন্ট SO_2 ও Na_2CO_3 মিশ্রণে ডুবানো হয়; পরে চামড়াকে নমনীয় করার জন্য তেল-চর্বি মিশ্রণে ডুবানো হয়; একে **কারিং** বলে], ইস্ত্রি করা, চামড়ার চাকচিক্য বৃদ্ধি বা **জ্যাকিং** করা, চামড়াকে শুকিয়ে কোম্পানির নাম অ্যামবোস ইত্যাদি করা হয়।

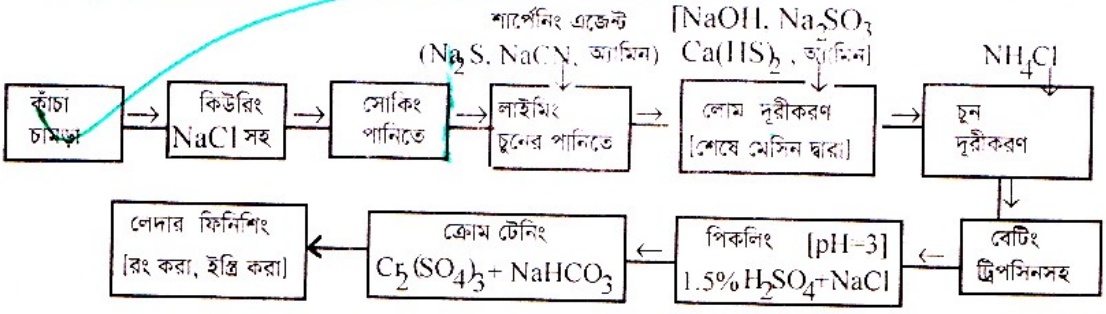

প্রবাহচিত্র – ৫.১২ : চামড়া টেনিং প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র

জেনে নাও : ক্রোম টেনিং প্রক্রিয়াটিকে ওপরে সহজভাবে দেখানো হলেও এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ জটিল প্রক্রিয়াটিতে $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ আয়নের মধ্যে 'ওলেশন' (Olation) ও 'অক্সোলেশন' (Oxolation) ঘটে। এ দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকর টেনিং এজেন্ট হিসেবে হেক্সা অ্যাকুয়া ক্রোমিয়াম (III) আয়ন কোলাজেন শিকলের পেপটাইড বন্ধন ($-CO-NH-$) এর পরিবর্তে Cr^{3+} আয়ন সন্নিবেশ বন্ধন ও প্রাইমারি যোজ্যতা দ্বারা যুক্ত হয়। এর ফলে এনজাইম ট্রিপসিন দ্বারা পেপটাইড বন্ধনের আর্দ্র বিশ্লেষণ রোধ করে চামড়াকে পচন বিয়োজন থেকে মুক্ত রাখে।

ওলেশন : যে প্রক্রিয়ায় জলীয় দ্রবণে জটিল সন্নিবেশ ধাতব আয়ন যেমন $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ আয়ন পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনের মাধ্যমে পলিমারিক অক্সাইড গঠন করে, তাকে ওলেশন বলে।

অক্সোলেশন : যে প্রক্রিয়ায় জলীয় দ্রবণে জটিল সন্নিবেশ ধাতব আয়ন যেমন $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনের মাধ্যমে ধাতব অক্সো ডাইমার গঠন করে, তাকে অক্সোলেশন বলে। ক্ষেত্র বিশেষে ওলেশন ও অক্সোলেশন উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। ওলেশন ও অক্সোলেশন ক্রোম টেনিং এ ক্রিয়াশীল থাকে।

(i) ক্রোম টেনিং মিশ্রণে pH মান 3 থেকে বৃদ্ধির সাথে $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ আয়নের একটি H_2O লিগ্যান্ডের $-OH$ বন্ধন আয়নিত হয়ে হাইড্রক্সাইড কম্পেক্স $[Cr(H_2O)_5OH]^{2+}$ তৈরি করে, যা হলো-$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ এর কনজুগেট ক্ষারক।

$$\underset{\text{অম্ল}}{[Cr(H_2O)_6]^{3+}} \rightleftharpoons \underset{\text{কনজুগেট ক্ষারক}}{[Cr(H_2O)_5OH]^{2+}} + H^+$$

(iii) হাইড্রক্সাইড কম্পেক্স আয়ন $-OH$ লিগ্যান্ডের মাধ্যমে দ্বিতীয় পৈতৃক জটিল আয়নের Cr পরমাণুর সাথে সন্নিবেশ বন্ধন গঠন দ্বারা ওলেশন প্রক্রিয়াটি শুরু করে। তখন দুটি Cr পরমাণু $-OH$ লিগান্ড দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং একই সাথে একটি H_2O অণু প্রতিস্থাপিত হয়।

$$[Cr(H_2O)_5OH]^{2+} + [Cr(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons [\{Cr(H_2O)_5\}_2OH]^{5+} + H_2O$$

(iii) উৎপন্ন 5+ আয়নে থাকা অবশিষ্ট H_2O লিগ্যান্ড ও OH^- লিগ্যান্ড তখন অধিক অম্লধর্মী হয়। ফলে আয়নীকরণ ও ঘনীভবন আরো উচ্চ pH মানের দ্রবণে সহজে ঘটতে থাকে। পরিশেষে অক্সোলেশন ও ওলেশন দ্বারা ধাতব পলিমারিক অক্সাইড গঠিত হয়, যা কোলাজেন-ক্রোমিয়াম– অক্সো জটিল শিকল গঠন করে।

(গ) উদ্ভিজ্জ টেনিং (Vegetable tanning) : উদ্ভিজ টেনিং হলো একটি পুরাতন পদ্ধতি, তবে তা এখনো ব্যবহৃত হয়। এজন্য এসিড পিকলিং-এর প্রয়োজন হয় না। চুন দূর করার পর চামড়াকে টেনিং দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়। প্রথমে অল্প ঘনমাত্রার টেনিং দ্রবণে ডুবিয়ে রেখে পরবর্তীতে আরো বেশি ঘনমাত্রার টেনিং দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়। এভাবে ক্রমাগত বেশি ঘনমাত্রার ট্রেনিং দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়। এরূপে টেনিং সম্পন্ন হতে কয়েক সপ্তাহ সময় প্রয়োজন হয়। এ সময় চামড়ার ভেতর টেনিং প্রবেশ করে চামড়াকে নমনীয় করে। উদ্ভিজ্জ টেনিংকৃত নরম চামড়া লাগেজ ও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

উদ্ভিজ্জ টেনিং পদার্থগুলো রাসায়নিকভাবে (i) ক্যাটিকল (catechol) ও (ii) পাইরোগ্যালল (pyrogallol) শ্রেণিভুক্ত ফেনল। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ জাতীয় বৃক্ষের বাকল, মূল ও কাঠ থেকে এসব টেনিং পদার্থ সংগ্রহ করা হয়।

MCQ-5.9 চামড়ার টেনিং করার উদ্দেশ্য হলো চামড়াকে প্রাকৃতিক পচন ক্রিয়ারোধক করা। তাই টেনিং প্রক্রিয়ায়-
(i) শার্পেনিং এজেন্ট দ্বারা আন্তঃপ্রোটিন শিকলের (–S–S–) বন্ধন ভেঙ্গে দেয়া হয়;
(ii) চুন দ্বারা চামড়া থেকে চর্বি ও গ্রীজ দূর করা হয়।

(iii) কোলাজেন পলিপেপটাইড শিকলে $-CO\ddot{N}H-$ বন্ধনের সাথে Cr^{3+} আয়নের সন্নিবেশ বন্ধন ঘটিয়ে এনজাইম ট্রিপসিনের আর্দ্র বিশ্লেষণ রোধ করা হয়।

কোনটি সঠিক হবে?

(ক) (i) ও (ii) (খ) (ii) ও (iii) (গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

শিক্ষার্থীর কাজ :

প্রশ্ন-৫.৭ : সিলিকাবালি কোন্ কোন্ শিল্পে ব্যবহৃত হয়? এরূপ যে কোনো একটি শিল্প সামগ্রী উৎপাদনের মূলনীতি সমীকরণসহ লেখ।

প্রশ্ন-৫.৮ : পাল্প-পেপার উৎপাদনের মূলনীতি সংক্ষেপে লেখ।

প্রশ্ন-৫.৯ : টেনিং বলতে কী বোঝায়? টেনিং প্রক্রিয়ার ধাপগুলো আলোচনা কর।

৫.৭.১ সিমেন্ট শিল্পের দূষকসমূহ
Pollutants in Cement Industry

ধূলিকণা : সিমেন্ট তৈরির সময় কাঁচামাল প্রধানত লাইমস্টোন বা চুনাপাথর ও ক্লে প্রথমে মেসিনে ভেঙ্গে ছোট টুকরা এবং পরে মেসিনে পিষে পাউডার অবস্থায় পরিণত করা হয়। পরে মিশ্রণকে ঘূর্ণায়মান চুল্লি (rotary kiln) তে উত্তপ্ত করা হয়। এরূপে প্রাপ্ত ক্লিংকারকে 3% জিপসামের সাথে মিশানো হয়। প্রতিটি ধাপে এ সব কঠিন পদার্থ অতি ক্ষুদ্র কণা আকারে বাতাসে ছড়িয়ে যায়। এরূপে সিমেন্ট কারখানার চিমনি থেকে নির্গত **কঠিন পদার্থের সূক্ষ্ম কণা বাতাসে ভাসমান অবস্থায় দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে**। বাতাসে ছড়িয়ে পড়া এসব কঠিন পদার্থের সূক্ষ্ম কণা বিভিন্ন স্থানে ধুলা হিসেবে জমা হয়। তোমরা যে কোনো সিমেন্ট কারখানায় গেলে সেখানের চারদিকে এরূপ ধূলিকণার স্তর দেখতে পাবে।

চুল্লির বর্জ্য গ্যাস : সিমেন্ট কারখানায় ক্লিংকার তৈরিতে ঘূর্ণায়মান চুল্লিতে প্রচুর কয়লা অথবা প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো হয়। চুল্লির বর্জ্য গ্যাসে CO_2 ও SO_2 গ্যাস থাকে। এর সাথে CO গ্যাস ও নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ, NO_x বায়ুদূষকরূপে বায়ুকে দূষিত করে।

দূষকের প্রভাব : এসব দূষক গ্যাস ও কঠিন রাসায়নিক বস্তুর সূক্ষ্ম কণাসমূহ মানুষের শ্বাস নালী ও ফুসফুসে ঢুকে শ্বাসযন্ত্রের ক্ষতিকর রোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া সালফার ও নাইট্রোজেনের অম্লধর্মী অক্সাইডসমূহ বাতাসের জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে H_2SO_4 ও HNO_3 উৎপন্ন করে, যা বৃষ্টির জলে মিশে এসিড বৃষ্টি সৃষ্টি করে। এর প্রভাবে জমির pH মান কমে গিয়ে মাটি উর্বরতা হারায় এবং অনেক গাছ-পালা বিনষ্ট হয়।

৫.৭.২ ইউরিয়া শিল্পের দূষকসমূহ
Pollutants in Urea Plant

প্রাকৃতিক গ্যাস হতে ইউরিয়া উৎপাদনে তিনটি প্রধান ধাপ আছে। প্রতিটি ধাপে কোনো না কোনো দূষক পরিবেশকে দূষিত করে। এসব দূষকের মধ্যে রয়েছে গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন দূষক। প্রাকৃতিক গ্যাসের দহনের মাধ্যমে গ্যাসীয় দূষক সৃষ্টি হয়। সংক্ষেপে এক্ষেত্রে সৃষ্ট বায়ু দূষক, পানি দূষক ও মাটি দূষকের বর্ণনা নিম্নরূপ :

(ক) গ্যাসীয় দূষক : গ্যাসীয় বায়ু-দূষকের মধ্যে C, N, S এর অক্সাইডসমূহ এবং NH_3 রয়েছে।

(১) প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদনের সময় বায়ু দূষকরূপে CO_2, N-এর অক্সাইডসমূহ (NO_x), SO_2, CO গ্যাস উৎপন্ন হয় [সারণি ৫.৫ দ্রষ্টব্য]।

সারণি ৫.৫ : অ্যামোনিয়া উৎপাদনের সময় সৃষ্ট বায়ু দূষকসমূহ

দূষকসমূহ	জ্বালানি গ্যাস হতে সৃষ্ট দূষক, (kg/ প্রতি টন NH_3)	CO_2 পৃথককরণে (kg/ প্রতি টন NH_3) উৎপাদনে)
CO_2	500	1200
NO_x	0.6 – 1.3	...
SO_2	0.1 – হতে কম	...
CO	0.03 হতে কম	...

(২) ইউরিয়া উৎপাদনের সময় বিভিন্ন ধাপে কারখানা থেকে NH_3 গ্যাস নির্গত হয়ে বায়ুর দূষণ ঘটে। প্রতি টন ইউরিয়া উৎপাদনের সময় (i) অ্যামোনিয়া রিসাইক্লিং কালে 0.1– 0.5 kg NH_3; (ii) ইউরিয়া দ্রবণ ঘনীভূত করার সময় 0.1 – 0.2kg NH_3 এবং (iii) দানাদার ইউরিয়া তৈরির সময় 0.2 – 0.7 kg NH_3. টাওয়ার ও অন্যান্য অংশ হতে নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়।

(খ) বর্জ্য–পানিতে দূষকসমূহ : অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়া উৎপাদনের সময় বর্জ্য-পানিতে (waste-water) অ্যামোনিয়া ও বিভিন্ন নাইট্রোজেনের যৌগ দূষক হিসেবে মিশে থাকে। অ্যামোনিয়া উৎপাদনের সময় প্রতি ঘনমিটার বর্জ্য-পানিতে 1kg পর্যন্ত NH_3, 1kg পর্যন্ত মিথানল দূষক হিসেবে থাকে। প্রতি টন ইউরিয়া উৎপাদনের সময় প্রতি ঘনমিটার বর্জ্য পানিতে 0.1 – 2.6 kg ইউরিয়া ও নাইট্রোজেন যৌগ থাকে।

(গ) কঠিন দূষক : প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে H_2 উৎপাদন ও NH_3 সংশ্লেষণে ব্যবহৃত প্রভাবকসমূহ এদের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেলে তা পরিবেশে বর্জ্য পদার্থরূপে পরিত্যক্ত হয়। এ সব ধাতব কঠিন পদার্থ পরিবেশে দূষকরূপে কাজ করে। এছাড়া চুনাপাথর ও চুনের গুঁড়া এবং ইউরিয়া প্যাকেজিং–এ ব্যবহৃত প্লাস্টিক ব্যাগ পরিত্যক্ত অবস্থায় দূষকের মধ্যে পড়ে।

৫.৭.৩ চামড়া শিল্পের দূষক

Pollutants in Tannery

সবচেয়ে বেশি পরিবেশ দূষণকারী শিল্প কারখানার মধ্যে চামড়া শিল্প অন্যতম। চামড়া শিল্প কারখানার বর্জ্য পানিতে দ্রবীভূত ও অদ্রবীভূত এবং জৈব ও অজৈব কঠিন পদার্থ থাকে; যা **পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) এর হ্রাসের কারণ হয়ে পড়ে**। এছাড়া ঐ বর্জ্য পানিতে ক্রোমিয়াম ধাতুর লবণ থাকে, যা **খাদ্য শৃঙ্খলে যুক্ত হয়ে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে**। প্রোটিন জাতীয় বর্জ্য পদার্থের বিয়োজনে সৃষ্ট হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), অ্যামোনিয়া (NH_3) এবং উদ্বায়ী বিভিন্ন জৈব যৌগের কারণে চামড়া কারখানার ভেতরে ও বাইরের **বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়**। চামড়া শিল্প কারখানার কঠিন বর্জ্যের পরিমাণও খুব বেশি থাকে। সব মিলে চামড়া শিল্প কারখানা হতে গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন–এ তিন শ্রেণির দূষক নির্গত হয়।

(ক) গ্যাসীয় দূষক : পানির সংস্পর্শে চামড়া হতে চর্বি ও প্রোটিনের বিযোজনে বিভিন্ন **ফ্যাটি এসিড ও অ্যামাইনো** এসিড উৎপন্ন হয়। এছাড়া নির্গত H_2S গ্যাস, NH_3 গ্যাস উভয়ই বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময়। বাতাসে 20 ppm বা 20 mg/m^3 ঘনমাত্রার H_2S গ্যাস মানুষের বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটাতে পারে। বাতাসে সর্বোচ্চ অনুমোদিত অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা হলো 5mg/m^3। অথচ অনেক ক্ষেত্রে বাতাসে এর কাছাকাছি বা বেশি পরিমাণে H_2S এবং NH_3 থাকে।

(খ) বর্জ্য-পানি দূষক : চামড়া কারখানায় ব্যবহৃত প্রচুর NaCl বর্জ্য পানিতে মিশে থাকে। এছাড়া **চুন, Na_2S ও অ্যামোনিয়াম লবণ, H_2SO_4, ক্রোমিয়াম লবণ ইত্যাদি ঐ বর্জ্য পানিতে থাকে**। ফলে পানিতে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ (TDS) ও ক্লোরাইড আয়নের পরিমাণ খুব বেশি থাকে।

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতি বছর 6.5 মিলিয়ন টন চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এর জন্য প্রায় 3.5 মিলিয়ন টন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। এর বেশির ভাগ বর্জ্য-পানিতে মিশে প্রাকৃতিক দূষণ ঘটায়। প্রতি টন চামড়া উৎপাদনে 45–50 কিউবিক মিটার পানির অপচয় ঘটে। এ ট্যানারি বর্জ্য–পানি শোধন না করে অনেক কারখানার নিকটবর্তী জমিতে ফেলে। এর ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট ও পরিবেশের পানি দূষিত হয়। খাদ্য শৃঙ্খলে ধাতব আয়ন যেমন ক্রোমিয়াম আয়ন (Cr^{3+} আয়ন) প্রবেশের মাধ্যমে উদ্ভিদ, পশু-পাখি ও মানব শরীরে প্রবেশ করলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

(গ) কঠিন দূষক পদার্থ : তোমরা এর মধ্যে জেনেছ, প্রতি টন চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের পর 800 kg কঠিন বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। এ সবের মধ্যে বর্জ্য চামড়ার টুকরা, পশুর লোম, চামড়ার সাথে যুক্ত পশুর মাংস ও ক্রোমিয়াম আয়ন থাকে। এ সব প্রোটিন জাতীয় জৈব পদার্থের পচন ও বিযোজনের ফলে বিভিন্ন বিষাক্ত ও দুর্গন্ধ গ্যাস উৎপন্ন হয়। আবার **বর্জ্য-চামড়া থেকে তৈরি poultry–food হাঁস-মুরগির খাদ্যরূপে ব্যবহারে খাদ্য-শৃঙ্খলে ক্রোমিয়াম দূষণ ঘটে**।

৫.৭.৪ টেক্সটাইল ও ডায়িং শিল্পের দূষকসমূহ

Pollutants in Textile and Dying Industries

টেক্সটাইল শিল্পও অন্যতম প্রধান পরিবেশ দূষণকারী শিল্প। টেক্সটাইল শিল্পকারখানা থেকে বিভিন্ন ফাইবার বা সুতা, কাপড়ের টুকরা প্রভৃতি বর্জ্যরূপে পরিত্যক্ত হয়। তবে এসব কঠিন দূষক বেশি সমস্যা সৃষ্টি করে না। সমস্যা সৃষ্টি করে টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত হাজারো রঞ্জক পদার্থ।

সমগ্র পৃথিবীতে টেক্সটাইল শিল্পে প্রায় 10,000 রঞ্জক পদার্থ বা, ডাই (dye) কাপড় রং করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এসব ফেব্রিক ডাই বা রঙের বার্ষিক উৎপাদন 7–10 লক্ষ টন। ব্যবহৃত এসব রঞ্জকের 10–25% পরিমাণে রঞ্জক প্রক্রিয়ায় অপব্যবহৃত হয় এবং পরিবেশে কোনো না কোনোভাবে মিশে গিয়ে পরিবেশের দূষণ ঘটায়। আবার 2 – 20% রঞ্জক সরাসরি পানিতে বর্জ্য হিসাবে মিশে পানিকে দূষিত করে। এসব রঞ্জক পানিতে মিশে পানিকে যেমন বর্ণযুক্ত করে, তেমনি পানিকে পানের অযোগ্য করে। কারণ এসব রঞ্জক পদার্থের অধিকাংশ নিজে অথবা এদের বিযোজনে সৃষ্ট উৎপাদগুলো বিষাক্ত ক্যান্সার উৎপাদক (carcinogens) ও জীবকোষের প্রকৃতি পরিবর্তনকারক (mutagenic) রূপে কাজ করে। রঞ্জকসমূহের বিযোজনে সৃষ্ট উৎপাদের মধ্যে বেনজিডিন, ন্যাফথ্যালিন ও অন্যান্য অ্যারোমেটিক যৌগ রয়েছে।

ডায়িং শিল্প থেকে যে সব পদার্থ পরিবেশে দূষকরূপে মিশে যায় সেগুলো হলো– (১) অ্যারোম্যাটিক অ্যামিন, (২) প্রচুর রঞ্জক পদার্থ, (৩) ক্ষার ও লবণ, (৪) ভারী ধাতু Pb ও Hg ধাতুর যৌগসমূহ। **পানিতে রঞ্জক মিশে পানিকে রঙিন করে, পানির DO হ্রাস করে; একই সাথে পানির BOD ও TDS এর মান বৃদ্ধি করে।**

টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত রঞ্জক পদার্থের স্থায়িত্ব বেশি হওয়া প্রয়োজন, যেন কাপড়ের রং দীর্ঘস্থায়ী হয়। টেক্সটাইল রঞ্জক হিসেবে এটি ভালো হলেও পরিবেশের জন্য তা খুবই ক্ষতিকর। সাধারণ জৈব যৌগসমূহ সূর্যালোকের তাপমাত্রা, বায়ুর উপাদান দ্বারা সহজে বিযোজিত হয়; ফলে এদের ক্ষতিকারক প্রভাব অল্প দিনে দূর হয়। কিন্তু রঞ্জক শ্রেণির যৌগসমূহ খুবই স্থিতিশীল হওয়ায় বহুদিন যাবৎ এসব রঞ্জক মাটিতে ও পানিতে অপরিবর্তিত থেকে যায়।

★ 'বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য মতে, পৃথিবীতে বিভিন্ন শিল্পের মাধ্যমে যত দূষণ ঘটে, তার 20% এর জন্য দায়ী হলো টেক্সটাইল ও ডায়িং শিল্প। এ শিল্পের দূষিত পানিতে 72 প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এ শিল্পের দূষিত পানি থেকে প্রায় 30 টি রাসায়নিক পদার্থ ETP এর মাধ্যমে আলাদা করা যায় না। টেক্সটাইল ও ডায়িং শিল্পের ক্ষতিকর দূষকের মধ্যে রয়েছে Cr, Cd, Co, Pb, Ni, Hg ইত্যাদি ভারী ধাতুর আয়ন।

বিভিন্ন শিল্পের দূষকসমূহ ও তাদের ক্ষতিকর প্রভাবের সংক্ষিপ্ত সার :

শিল্প ক্ষেত্র	শিল্পের বর্জ্য দূষক	ক্ষতিকর প্রভাব
(১) সিমেন্ট শিল্প :	(১) চুনাপাথর, ক্লে ও ক্লিংকারের সূক্ষ্ম গুড়া (২) উড়ন্ত ছাই, CO_2, SO_2, NOx গ্যাসসমূহ।	(১) সূক্ষ্ম গুড়া মানুষের শ্বাসনালী ও ফুসফুসে ঢুকে শ্বাসযন্ত্রে ক্ষতিকর রোগ সৃষ্টি করে। (২) বর্জ্য অম্লধর্মী গ্যাস এসিড বৃষ্টি সৃষ্টি করে।
(২) ইউরিয়া শিল্প :	(১) তরল NH_3, (2) সূক্ষ্ম ইউরিয়া কণা ও নাইট্রোজেন যৌগ (৩) বর্জ্য প্রভাবক গুঁড়া (৪) চুনাপাথর ও চুনের বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যাগ ইত্যাদি।	(১) পরিবেশের বায়ু, পানি ও মাটির ক্ষারীয় দূষণ ঘটে। (২) বায়ু দূষণে শ্বাস যন্ত্রে রোগ; পানি দূষণে মাছ মারা যায়, মাটি দূষণে উর্বরতা হ্রাস পায়।
(৩) চামড়া শিল্প :	(১) ফ্যাটি এসিড, অ্যামাইনো এসিড, H_2S, NH_3, Na_2S, H_2SO_4, Cr–লবণ, চামড়ার টুকরা, পশুর লোম ইত্যাদি।	(১) পরিবেশে দুর্গন্ধ ছড়ায়, (২) পানির DO হ্রাস পায়, (৩) খাদ্য শৃঙ্খলে Cr ধাতুর ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে।
(৪) টেক্সটাইল ও ডায়িং শিল্প :	(১) সুতার বর্জ্য কাপড়, (২) বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ, (৩) ভারী ধাতু Cr, Cd, Co, Pb, Ni, Hg ইত্যাদির লবণ, (৪) Na_2S, NaOH, জৈব এসিড ও অ্যারোমেটিক অ্যামিন।	(১) পরিবেশে দূষণ ঘটে, (২) পানিতে রঞ্জক পদার্থ মিশে DO হ্রাস পায়, BOD ও TDS বৃদ্ধি পায়। (৩) খাদ্য শৃঙ্খলে ভারী ধাতু প্রবেশ করে মানুষের দেহে ক্যানসার ও বিভিন্ন মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ :

প্রশ্ন-৫.১০ : নিম্নোক্ত শিল্পের দূষকসমূহ সারণি আকারে সাজিয়ে উপস্থাপন কর : (১) সিমেন্ট শিল্প, (২) ইউরিয়া শিল্প, (৩) চামড়া শিল্প, (৪) টেক্সটাইল ও ডায়িং শিল্প।

প্রশ্ন-৫.১১ : নিচের উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দাও। [দি. বো. ২০১৬]

টেক্সটাইল শিল্প —(বায়ু দূষক গ্যাস)→ বায়ু

(ক) উদ্দীপকের শিল্পটি কীভাবে বায়ুকে দূষিত করে তা ব্যাখ্যা কর।

(খ) উল্লেখিত শিল্পের বায়ু দূষণ কীভাবে রোধ করা যায় তা বিশ্লেষণ কর।

৫.৮ বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের মূলনীতি

Principle of Controlling Air Pollution

এ পর্যন্ত আলোচনায় তোমরা জেনেছ, বায়ু দূষণের মূল কারণ হলো- বায়ুতে ভাসমান কঠিন বস্তুর কণাসমূহ এবং C, N ও S এর অক্সাইডসমূহের উপস্থিতি। বায়ুতে এ সব দূষক পদার্থ একবার মিশে গেলে বায়ু থেকে এদের অপসারণ করা খুবই কঠিন। সুতরাং এ সব দূষক সৃষ্টির উৎসেই এদেরকে বায়ুতে না মেশার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব দূষক সৃষ্টির উৎস হলো বিভিন্ন শিল্পকারখানা এবং মোটরযানের জ্বালানির বর্জ্য-গ্যাস। আমরা এক্ষেত্রে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের তিনটি কৌশলের মূলনীতি আলোচনা করব :

(১) প্রভাবকীয় রূপান্তর (catalytic conversion) : বায়ু দূষণের প্রধান উৎস হলো-কলকারখানায় ও মোটরযানে জ্বালানি দহনে উৎপন্ন বর্জ্য গ্যাস। কলকারখানায় কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানি পোড়ানো হয়। যানবাহনসমূহে পেট্রোল, ডিজেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, মটর যান থেকে নির্গত বর্জ্য গ্যাসে 1-2% CO, 500–1000 ppm অদহনকৃত হাইড্রোকার্বন, 100–3000 ppm NO গ্যাস থাকে।

বর্তমানে আধুনিক বিশ্বে সব মোটরযানে এবং কলকারখানায় দহন স্থলে জ্বালানির বর্জ্য বায়ু দূষক গ্যাসকে প্রভাবকীয় বা কেটালাইটিক কনভার্টার দ্বারা রূপান্তর করে পরিবেশবান্ধব গ্যাসরূপে বায়ুতে মুক্ত করা হয়। এ কনভার্টারে প্রভাবকরূপে প্লাটিনাম, প্যালাডিয়াম বা রোডিয়াম ধাতুর সূক্ষ্ম চূর্ণকে সিরামিকের তৈরি মৌচাকের ন্যায় জালির মধ্যে টিউব বন্ধ করে রাখা হয়। দহন স্থান হতে নির্গত উত্তপ্ত বর্জ্য দূষক গ্যাস ধাতব প্রভাবকের সংস্পর্শে আসলে অদহনকৃত জ্বালানি বাষ্প ও CO গ্যাস বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণ জারিত হয়ে CO_2 গ্যাসে পরিণত হয় এবং বর্জ্য গ্যাসের NO গ্যাস CO দ্বারা বিজারিত হয়ে N_2 গ্যাসরূপে বাতাসে মুক্ত হয়।

$$C_xH_y + (x + y/4)\, O_2 \xrightarrow{Pt.\ \Delta} xCO_2 + y/2\ H_2O$$

$$2NO + 2CO \longrightarrow 2CO_2 + N_2$$

$$2CO + O_2 \longrightarrow 2CO_2$$

চিত্র ৫.১৩ : অটোমোবাইল ইঞ্জিনের জ্বালানি বর্জ্য বায়ুদূষকের কেটালাইটিক কনভার্টারে শোধন।

(২) দূষক গ্যাস দ্রবীভূতকরণ (Dissolving Pollutant) : শিল্প কারখানার চিমনি দিয়ে নির্গত বর্জ্য গ্যাস বা ফ্লু-গ্যাস বায়ু দূষক শ্রেণিভুক্ত অম্লধর্মী গ্যাসসমূহকে বিশেষত SO_2 গ্যাসকে ক্ষারকীয় পানির মিশ্রণে শোষণ করে পরিবেশ দূষণ মুক্ত রাখা যায়, এ প্রক্রিয়াকে ফ্লু-গ্যাস ডিসালফারিজেশন বা FGD প্ল্যান্ট বলে। FGD প্লান্টে চুনাপাথর গুঁড়া ও চুনের পানিতে ফ্লু-গ্যাস চালনা করে ক্ষতিকারক SO_2, NO_2 ও CO_2 শোষণ করা হয়। এতে উপজাতক জিপসাম উৎপন্ন হয়।

$$CaCO_3 + SO_2 \longrightarrow CaSO_3 + CO_2$$
$$CaO + SO_2 \longrightarrow CaSO_3$$
$$2CaSO_3 + O_2 + 4H_2O \longrightarrow 2[CaSO_4.2H_2O]$$
$$CaO + CO_2 \longrightarrow CaCO_3$$
$$CaO + 2NO_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow Ca(NO_3)_2$$

(৩) সূক্ষ্ম ছাঁকনি পদ্ধতি (Fine Particle filtration) : বায়ু দূষকদের মধ্যে অন্যতম হলো বায়ুতে মিশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন বস্তু কণা। যেমন সিমেন্ট কারখানা থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম কঠিন বায়ু দূষকসমূহ। তাই কারখানার নির্গত বর্জ্যের সূক্ষ্ম কঠিন দূষক পদার্থকে সূক্ষ্ম ছাঁকনির মাধ্যমে ছেঁকে দূষণ মুক্ত করে বর্জ্য গ্যাসকে বায়ুতে মুক্ত করা যায়। তোমরা বাড়ির এয়ারকন্ডিশন মেসিনে এ ধরনের সূক্ষ্ম ছাঁকনি দেখতে পারবে। কলকারখানায় একই ধরনের সূক্ষ্ম-ছাঁকনি ব্যবহার করা যায়। তবে তা হবে বেশ বড় আকারের। এরূপ সূক্ষ্ম ছাঁকনি কয়েকদিন পর পর পরিষ্কার করে নিতে হয়।

৫.৯ ইটিপি'র কার্যপ্রণালির মূলনীতি
Principle of Action of ETP

রাসায়নিক শিল্প কারখানার বর্জ্য পানি বা তরল পদার্থে জৈব ও অজৈব পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এ বর্জ্য পানিকে effluent বলা হয়। এরূপ শিল্প কারখানার effluent থেকে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থকে পৃথক করার প্রক্রিয়াকে effluent treatment plant বা ETP বলে। কারখানার প্রকৃতিভেদে বর্জ্য পানিতে দূষকের বিভিন্ন প্রকৃতি যেমন ধাতব আয়ন, জৈব পদার্থ ও জৈব যৌগ হতে পারে। চন্দ্রঘোনার পেপার মিলে গেলে তোমরা দেখতে পাবে পেপার মিলের বর্জ্য দূষিত পানি দ্বারা কর্ণফুলি নদীর পানিতে কীরূপ দূষণ ঘটছে। ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে ট্যানারির দূষিত বর্জ্য পানি দ্বারা কীরূপ দূষণ ঘটে চলেছে তা তোমরা সংবাদ মাধ্যম থেকে যেমন জানতে পার; নিজেরা সরেজমিনেও তা দেখতে পার। নদীর পানির এরূপ মারাত্মক দূষণ প্রতিরোধ করতে ETP হলো আধুনিক চিন্তার গ্রিন কেমিস্ট্রির বারটি নীতির অন্যতম প্রয়োগ। বাংলাদেশে বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে শিল্প কারখানা জোন সৃষ্টি করে বিভিন্ন শিল্পের বর্জ্য পানিকে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় কম্বাইন্ড ইটিপি বা CETP এর মাধ্যমে পরিশোধন প্রক্রিয়ার কার্যক্রম অনুমোদিত হয়েছে। E T P' র কার্য-প্রণালির তিনটি প্রক্রিয়ার মূলনীতি নিচে আলোচনা করা হলো।

(১) তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া : যে সব শিল্প কারখানার বর্জ্য পানিতে ধাতুর আয়নের পরিমাণ বেশি থাকে, ঐ সব ক্ষেত্রে বর্জ্য পানির ধাতব আয়ন পৃথক করার জন্য তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা যায়। যেমন ট্যানারির ক্রোমিয়াম আয়ন এ প্রক্রিয়ায় পৃথক করা যায়। $M^{n+} + n\bar{e} \longrightarrow M$, $Cr^{3+} + 3\bar{e} \longrightarrow Cr$

(২) প্রভাবন প্রক্রিয়া : বর্জ্য পানিতে বিদ্যমান ক্ষতিকারক জৈব যৌগসমূহকে প্রভাবকের উপস্থিতিতে অক্সিজেন দ্বারা জারিত করে CO_2, H_2O ও N_2 গ্যাসে পরিণত করার জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এ উদ্দেশ্যে যে সব প্রভাবক ব্যবহার করে এর সঠিক ফর্মুলা বাণিজ্যিক স্বার্থে গোপন রাখে। তবে এটুকু জানা যায় যে, এ সব প্রভাবক হলো অবস্থান্তর ধাতু বা এদের যৌগ।

(৩) **জীব প্রযুক্তি প্রয়োগ** : ব্যাকটেরিয়া বা বিভিন্ন অণু বীজ বর্জ্য পানিতে থাকা বিভিন্ন জৈব যৌগ ও জৈব পদার্থকে ভক্ষিত বা বিযোজিত করে CO_2, NH_3 ও H_2O প্রভৃতি যৌগে পরিণত করে। পানিতে বিদ্যমান জৈব যৌগ ও জৈব পদার্থের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়। বর্জ্য পানিকে থিতানোর পর নির্দিষ্ট অণুজীব যোগ করে চৌবাচ্চায় রাখা হয়। অণুবীজ বৃদ্ধির পুষ্টিকারক (nutrient) পানিতে যোগ করে বায়ু চালনা করা হয়। অণুবীজ জৈব পদার্থ ও জৈব যৌগকে CO_2,NH_3ও H_2O যৌগে রূপান্তরিত করে। বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানি জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে পানি শোধনের জন্য ক্ষুদ্র প্ল্যান্ট বিক্রি করে।

প্রশ্ন-৫.১২ : (ক) ETP কী [সি. বো. ২০১৫]

: (খ) শিল্পে ETP ব্যবহার করা হয় কেন? [দি. বো. ২০১৫]

প্রশ্ন-৫.১৩ : নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও। [বি. বো. ২০১৫]

(A) গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ (B) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

(ক) উদ্দীপকে (B) থেকে নির্গত দূষক অম্লীয় গ্যাসসমূহ নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি লেখ।

(খ) উদ্দীপকে (A) এর কোন গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের জন্য ক্ষতিকর তা যথার্থ সমীকরণসহ ব্যাখ্যা কর।

MCQ-5.10 পরিবেশ দূষক নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি কার্যকর —

(i) C_xH_y, NO, CO এর জারণ-বিজারণের জন্য কেটালাইটিক কনভার্টার,

(ii) Cr^{3+} আয়ন, SO_2, NO_2 এর জন্য FGD প্ল্যান্ট,

(iii) ধাতব আয়ন, জৈব পদার্থের বর্জ্য পানির জন্য ETP.

কোনটি সঠিক হবে?

(ক) (i) ও (ii) (খ) (ii) ও (iii) (গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

৫.১০ আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, কপার, কাচ, কাগজ বা পেপার ও প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্রণালি
Recycling of Iron, Aluminium, Copper, Glass, Paper and Plastic

আমরা বাড়িঘরে, অফিসে, কলকারখানায় ব্যবহার্য ধাতুর তৈরি আসবাব ও বাসনপত্র, কাচ ও প্লাস্টিকের সামগ্রী ভেঙ্গে গেলে বা পুরানো হলে ব্যবহার অযোগ্য ধরে ফেলে দিই। এর ফলে পরিবেশের দূষণ ঘটতে পারে। বর্তমানে বিজ্ঞানের কৌশলে এসব বর্জ্য কঠিন ধাতব, কাচ, প্লাস্টিক ও কাগজ ইত্যাদিকে রিসাইক্লিং বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পূর্বের ব্যবহৃত সামগ্রী প্রস্তুতি করা সম্ভব।

রিসাইক্লিং (Recycling) : কোনো পুরাতন ব্যবহার অযোগ্য সামগ্রীকে পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পূর্বের ব্যবহৃত সামগ্রী অথবা অন্য ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী পুনরায় প্রস্তুতির প্রক্রিয়াকে **রিসাইক্লিং** বলা হয়। এতে পরিবেশ যেমন সুষ্ঠু থাকে; তেমনি প্রয়োজনীয় পদার্থের অপচয় রোধ হয়। পরিবেশের সুরক্ষায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র বিন্দুতে তিনটি **'R'** রয়েছে। যেমন, **Reduce** (হ্রাসকরণ), **Reuse** (পুনঃব্যবহার) ও **Recycle** (পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ)।

সুতরাং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রিসাইক্লিং হলো বর্জ্য পদার্থকে পূর্বের ব্যবহারযোগ্য পদার্থে রূপান্তর প্রক্রিয়া। **বর্জ্য রিসাইক্লিং প্রণালি থেকে নিম্নোক্ত সুফল পাওয়া যায়।**

(১) প্রাকৃতিক উৎসসমূহ যথাসম্ভব সংরক্ষণ করা, (২) শক্তির সাশ্রয় করা, (৩) কম খরচে পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করা, (৪) অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর অপচয় রোধ করা। (৫) কাঁচামালের ব্যবহার হ্রাস করা, (৬) বায়ু, পানি ও মাটি দূষণ হ্রাস করা। যেমন, বিভিন্ন রিসাইক্লিং প্রণালিতে নিম্নরূপ বিদ্যুৎ বা তাপশক্তির সাশ্রয় ঘটে– (১) আয়রন রিসাইক্লিং এ 60%, (২)

অ্যালুমিনিয়াম রিসাইক্লিং এ 95%, (৩) কপার রিসাইক্লিং-এ 85%। ৪। গ্লাস রিসাইক্লিং-এ 5–30% (৫) পেপার রিসাইক্লিং-এ 40%, (৫) প্লাস্টিক রিসাইক্লিং-এ 70%।

১। আয়রন রিসাইক্লিং : আয়রন ও ইস্পাত হলো একটি বহুল ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী বর্তমানে পুরাতন লোহার তৈরি জিনিসপত্র, লোহার তৈরি গাড়ির অংশ; এমনকি বিরাটাকার জাহাজের লোহাকে ছোট ছোট টুকরা করে কারখানায় নিয়ে রিসাইক্লিং করা হয়।

আয়রন রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ায় তিন ধরনের চুল্লি ব্যবহৃত হয়।

যেমন, (১) ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস (Electric Arc Furnace, EAF)

(২) বেসিক অক্সিজেন ফার্নেস (Basic Oxygen Furnace, BOF) (৩) ব্লাস্ট ফার্নেস (Blast Furnace)

রিসাইক্লিং প্রসেস : এ সব ফার্নেসে পুরাতন লোহার টুকরাগুলোকে 1300°C-এর উর্ধ্বে গলানোর পর ঐ গলিত লোহাকে বড় বড় লৌহ পিণ্ড বা Ingot আকারে ঠাণ্ডা করে পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটে পাঠানো হয়; সেখানে ঐ Ingot থেকে প্রয়োজনীয় লৌহসামগ্রী যেমন বিল্ডিং তৈরির রড, প্লেট ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় লৌহসামগ্রী তৈরি করা হয়।

২। অ্যালুমিনিয়াম রিসাইক্লিং : অ্যালুমিনিয়াম বিশুদ্ধ ধাতুরূপে এবং অন্য কোনো ধাতুর সাথে মিশ্রিত অবস্থায় সংকর ধাতুরূপে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে বিশুদ্ধ Al ধাতু হতে বাংলাদেশে কড়াই, কেটলি, থালাবাসন প্রভৃতি তৈরি করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন পানীয় তরলের কন্টেইনার বা ক্যান Al-ধাতু দ্বারা তৈরি করা হয়। ওষুধ শিল্পে ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল জাতীয় ওষুধকে Al শিটের কাগজে প্যাকেজিং করা হয়। ওজনে হালকা ও উজ্জ্বলতার জন্য যানবাহনের কাঠামো, বাড়িঘর, অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জানালার কাঠামো এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরিতে Al ধাতু বর্তমানে ব্যবহৃত হয়। বহুল ব্যবহৃত Al ধাতু নিম্নোক্ত ধাপে রিসাইক্লিং করা হয়।

(i) অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর পুরাতন সামগ্রী প্রথমে যান্ত্রিক বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা হয়। এরপর ছোট ছোট টুকরা করে ইলেকট্রিক ফার্নেসে 750°C তাপমাত্রার উর্ধ্বে গলানো হয়।

(ii) Al-ধাতু পানির সাথে বিক্রিয়ায় হাইড্রেটেড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের স্তর ও H_2 গ্যাস উৎপন্ন করে। এ H_2 গ্যাস Al ধাতু দ্বারা শোষিত অবস্থায় থাকে। ফার্নেস থেকে গলিত ধাতুমল পৃথক করে ঐ গলিত অ্যালুমিনিয়ামে হেক্সাক্লোরো ইথেন যোগ করা হয়। এটি তাপে বিযোজিত হয়ে ক্লোরিন উৎপন্ন করে এবং Cl_2 শোষিত হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে HCl গ্যাস হিসেবে দূরীভূত হয়।

(iii) গলিত অ্যালুমিনিয়াম থেকে অল্প নমুনা নিয়ে বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়। ফার্নেস থেকে গলিত ধাতুকে বের করে বিভিন্ন আকারের ধাতুপিণ্ড রূপে ঠাণ্ডা করা হয়। এরপর বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুতির জন্য এ Al-ধাতু পিণ্ড ব্যবহৃত হয়। বক্সাইটি আকরিক থেকে Al ধাতু নিষ্কাশনের তুলনায় রিসাইক্লিং কাজে 5% এর কম শক্তি ব্যয় হয়।

(iv) সংকর ধাতু তৈরি করতে গলিত অ্যালুমিনিয়ামের সাথে প্রয়োজনমতো কপার, জিংক, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন প্রভৃতি গলিত অবস্থায় মিশানো হয়।

৩। কপার রিসাইক্লিং : কপার একটি 100% রিসাইক্লিংযোগ্য ধাতু। বৈদ্যুতিক তার হিসাবে কপার বেশি ব্যবহৃত হয়। সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় এক বিলিয়ন মোবাইল সেট বিক্রি হয়। প্রতি সেট মোবাইলে গড়ে 14g কপার, প্রতিটি কারে 20–45 kg এবং প্রতিটি কম্পিউটারে 1 kg কপার ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রায় 40% এর বেশি কপারের চাহিদা কপার রিসাইক্লিং পদ্ধতির মাধ্যমে মেটানো হয়। কপার আকরিক থেকে Cu ধাতু নিষ্কাশনের তুলনায় কপার রিসাইক্লিং-এ মাত্র 15% শক্তি ব্যয় হয়। **কপার রিসাইক্লিং নিম্নোক্ত ধাপে করা হয়।**

(i) পুরানো কপার সামগ্রীকে একত্রিত করে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়।

(ii) এরপর কপার সামগ্রীর টুকরাগুলোকে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে নিয়ে প্রায় 1083°C তাপমাত্রার ঊর্ধ্বে গলানো হয়। গলিত কপারকে 1160°C তাপমাত্রায় কিছু সময় রেখে নির্গম ট্যাপের সাহায্যে বের করে সিলিন্ডার আকৃতির **বিলেট** (billet) হিসেবে ঠাণ্ডা করা হয়। পরে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির কারখানায় কপার বিলেট পাঠানো হয়।

৪। কাচ বা গ্লাস রিসাইক্লিং : কাচ একটি 100% রিসাইক্লিং যোগ্য পদার্থ। কারখানায় কাচ উৎপাদনের সময় কাঁচামালের সাথে ভাঙা কাচ যোগ করতে হয়। তাই পুরানো কাচের সামগ্রীর ভাঙা কাচ একইভাবে কারখানায় কাচ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। কাচের রিসাইক্লিং নিম্নোক্ত ধাপে করা হয়।

(i) গৃহস্থালী ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত পুরানো কাচের সামগ্রীকে বর্ণ অনুসারে গ্রুপিং করা হয়।

(ii) কাচের সামগ্রীগুলোকে পানিতে ধুয়ে খোলা বাতাসে শুকানো হয় এবং যান্ত্রিকভাবে ছোট টুকরায় পরিণত করা হয়।

(iii) কাচ উৎপাদনের মূল উপাদান মিশ্রণের সাথে এসব কাচগুঁড়া ফার্নেসে গলানো হয়। গলিত কাচ থেকে নতুন সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়।

৫। পেপার বা কাগজ রিসাইক্লিং : পেপার রিসাইক্লিং বলতে পুরাতন পত্রিকা, বই, ম্যাগাজিন, অফিসে ব্যবহৃত কাগজপত্র, শিক্ষার্থীর লেখা খাতাপত্র ইত্যাদির পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণকে বোঝায়। পেপার রিসাইক্লিং নিম্নোক্ত ধাপে করা হয়।

(i) প্রথমে পুরাতন ও ব্যবহৃত কাগজপত্রকে বড় পাত্র বা Vessel-এ রেখে সাবান পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলা হয়। এরপর ব্লিচিং এজেন্ট যোগ করে কাগজ পত্রে লেখা কালি ও ছাপার কালি দূর করা হয়।

(ii) সমগ্র মিশ্রণকে কয়েক ঘণ্টা যান্ত্রিকভাবে আলোড়িত করা হয়। তখন কাগজ ক্ষুদ্র পিণ্ড আকারে পরিণত হয়। এরপর ছাঁকন প্রক্রিয়ায় কাগজের মূল অংশ বা পাল্প পাওয়া যায়। এ পাল্প ব্যবহার করে নতুনভাবে পেপার তৈরি করা হয়। রিসাইক্লিং করা পাল্পের মান কিছুটা হ্রাস পায়।

৬। প্লাস্টিক রিসাইক্লিং : প্লাস্টিক একটি নাম হলেও প্রকৃতপক্ষে প্লাস্টিক বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত। ভিন্ন শ্রেণিভুক্ত প্লাস্টিককে এক সাথে রিসাইক্লিং করা যায় না। সাধারণভাবে দেখা যায়, ব্যবহৃত সামগ্রীর থার্মো প্লাস্টিক রিসাইক্লিং করে ভিন্ন সামগ্রী তৈরি করা হয়। যেমন পানীয় তরলের প্লাস্টিক বোতল গলানোর পর রিসাইক্লিং করে প্লাস্টিকের চেয়ার টেবিল তৈরি করা হয়।

নিম্নোক্ত ধাপে থার্মো প্লাস্টিক সামগ্রী রিসাইক্লিং করা হয়।

(i) প্রথমে বর্জ্য প্লাস্টিক সামগ্রীকে এদের রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী গ্রুপিং করা হয়। একই গ্রুপের প্লাস্টিককে বড় পাত্রে পানিতে রেখে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ ধুয়ে ফেলা হয়।

(ii) এরপর পরিষ্কার প্লাস্টিক সামগ্রীকে বড় পাত্রে উত্তাপে গলানো হয়।

(iii) গলিত প্লাস্টিক বিভিন্ন ছাঁচে ঢেলে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করা হয়।

৫.১১ সামাজিক ও পরিবেশ ক্ষেত্রে আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, কপার, কাচ, পেপার ও প্লাস্টিকের রিসাইক্লিং এর গুরুত্ব

Importance of Recycling of Fe, Al, Cu, Glass, Paper & Plastic in Social & Environment Concern

সাধারণভাবে বলা যায়, ব্যবহার্য পুরানো বস্তু সামগ্রীর রিসাইক্লিং-এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিদিন গৃহস্থালী, অফিস, কলকারখানা হতে অসংখ্য বস্তু-সামগ্রী পরিত্যাগ করা হচ্ছে। এ সব পরিত্যক্ত ও বর্জ্য বস্তুর আবর্জনা মিউনিসিপালিটির সেবকেরা শহরের উপকণ্ঠে নিম্নাঞ্চলে স্তূপ করে। এ সব আবর্জনার মধ্যে প্রকৃতিজাত ও ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পচনশীল বা বায়োডিগ্রেড্যাবল বস্তু কয়েকদিনের মধ্যে পচে মাটিতে মিশে যায়; কিন্তু ধাতু, কাচ ও প্লাস্টিকের পরিত্যক্ত বস্তুসামগ্রী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পচনশীল না হওয়ায় দীর্ঘদিনেও বিনষ্ট হয় না; বরঞ্চ পরিবেশের দূষণ বা ক্ষতি করে। বিশেষ করে প্লাস্টিক

সামগ্রী শহরাঞ্চলে নালা নর্দমা ও খালে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। পূর্বে রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে ভাঙা কাচ ও লোহার টুকরায় গ্রামের সাধারণ মানুষের পা কেটে গিয়ে মারাত্মক টিটেনাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। এখন রিসাইক্লিং চালু হওয়ায় গ্রাম ও শহরের লোকেরা এ সব সামগ্রী ফেরিওয়ালাদের কাছে বিক্রি করছে।

অনেক ফেরিওয়ালা গ্রামে ও শহরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পত্রিকা-কাগজ-বইপত্র, লোহার টুকরা, অ্যালুমিনিয়াম, কপারের পুরানো সামগ্রী, কাচ ও প্লাস্টিকের বোতল কম দামে কিনে আনে এবং দোকানিদের কাছে বেশি দামে বিকিয়ে অর্থ-উপার্জন দ্বারা জীবিকা চালায়। এতে গৃহকর্মীও অল্প কিছু আয় করে। এরূপে বেকার-দরিদ্র লোকেরা আর্থ-সামাজিকভাবে বেঁচে থাকে।

এসব পুরানো সামগ্রীর লোকাল রিসাইক্লিং করার ফলে ঐ সব সামগ্রীর বিদেশ থেকে আমদানি চাহিদা কমে যায়; দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, মনে কর : বাংলাদেশে প্রতি বছর এক লক্ষ টন আয়রনের প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে আয়রন ইন্ডাস্ট্রি না থাকায় এ এক লক্ষ টন আয়রন বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে। যদি অল্প খরচে রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ায় 30,000 টন আয়রন পাওয়া যায়; তবে অবশিষ্ট 70,000 টন আয়রন বিদেশ থেকে আমদানি করলে চাহিদা পূরণ হবে। ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বাড়বে। এতোক্ষণ তোমরা সাধারণভাবে পুরাতন পরিত্যক্ত সামগ্রীর রিসাইকেলের গুরুত্ব জেনেছ। এখন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রিসাইক্লিং এর গুরুত্ব জানতে পারবে।

১। আয়রন রিসাইক্লিং-এর গুরুত্ব : আয়রন হলো কাঠামো তৈরির ধাতু। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, অট্টালিকা, যানবাহন, কারখানার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাঠামো তৈরিতে আয়রন ব্যবহৃত হয়। এ সব ক্ষেত্রে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ব্যবহার অযোগ্য আয়রন বা স্ক্রেপ (scrap) জমা হয়। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, 1998 সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 75 মিলিয়ন টন ব্যবহার অযোগ্য স্ক্রেপ আয়রন রিসাইক্লিং করা হয় এবং প্রতি বছর গড়ে এর পরিমাণ প্রায় 10% হারে বেড়ে চলেছে। এ তথ্য থেকে বোঝা যায়, রিসাইক্লিং না হলে স্ক্রেপ আয়রন আমেরিকায় পরিবেশের কী পরিমাণ স্থান অকেজো করে রাখতো।

বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া কঠিন। এখানে পুরানো যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও গৃহস্থালী বর্জ্য লোহার সামগ্রী হতে প্রাপ্ত স্ক্রেপ আয়রনের পরিমাণ খুব বেশি নয়। তবে বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশ হতে আমদানিকৃত পুরাতন জাহাজের স্ক্রেপ আয়রনভিত্তিক অনেক স্টিল রি-রোলিং মিল (steel re-rolling mill) গড়ে ওঠেছে। এক্ষেত্রে পুরাতন জাহাজ ভাঙা কাজে এবং এসব রিরোলিং মিলে অনেক শ্রমিক ও শিক্ষিত যুবকেরা কাজ করে। তাই আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় আয়রন রিসাইক্লিং এর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। বেসরকারি হাউস-বিল্ডিং সংস্থার সদস্যরা দেশব্যাপী শহর ও শহরের উপকণ্ঠে সুউচ্চ বিল্ডিং তৈরি করে আধুনিক শহর গড়ে তুলছে। এতে প্রয়োজনীয় ইস্পাত ও লোহার রড যোগান দিচ্ছে বাংলাদেশের স্টিল-রিরোলিং মিলসমূহ। সরকারিভাবে দেশের যোগাযোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগ হচ্ছে 'রোড এন্ড হাইওয়ে সংস্থার' অধীনে হাজারো ব্রিজ, রাজধানী ও জনবহুল শহরে যানজট নিরসনে তৈরি হচ্ছে 'ফ্লাই রোড', সময়ের দাবিতে যোগ হচ্ছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনার দুপাড় সংযোগকারী মহাসেতুসমূহ। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উচ্চমানের ইস্পাত ও লোহার রড আসছে স্টিল-রিরোলিং মিল থেকে। এ সব ক্ষেত্রে সমাজের হাজার হাজার শ্রমিক, শিক্ষিত যুবক ও ইঞ্জিনিয়ার কর্মরত আছেন।

সুফল : (১) পরিবেশের ক্ষেত্রেও আয়রন রিসাইক্লিং এর গুরুত্ব অপরিসীম। রিসাইক্লিং না হলে, এসব আয়রন স্ক্রেপ বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো অবস্থায় পরিবেশে জঞ্জাল সৃষ্টি করতো

(২) বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজনীয় সব আয়রন উৎপাদন করতে হতো আয়রন আকরিক (Fe_2O_3) থেকে।

(৩) ফলে ব্লাস্ট ফার্নেসে ব্যবহৃত কয়লার দহনে সৃষ্ট ফ্লু-গ্যাসের যেমন CO_2, CO, SO_2 ও নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ দ্বারা বৈশ্বিক পরিবেশের অধিকতর দূষণ ঘটতো।

(৪) আয়রন রিসাইক্লিং পরিবেশ দূষণ রোধ করছে।

(৫) পৃথিবীর সীমিত আয়রন আকরিক সাশ্রয়ে কিছুটা হলেও ভূমিকা রেখেছে।

২। অ্যালুমিনিয়াম রিসাইক্লিং এর গুরুত্ব : অ্যালুমিনিয়ামও আয়রনের মতো রিসাইক্লিংযোগ্য ধাতু। তবে আয়রনের মতো কাঠামো ধাতুরূপে অতি প্রয়োজনীয় ধাতু না হলেও অ্যালুমিনিয়াম হালকা ও ধাতুক্ষয় (corrosion) রোধী হওয়ায় এটি যানবাহন ও বিল্ডিংয়ের জানালার কাঠামো, বাসনপত্র তৈরিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাই স্ক্রেপ অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণও খুব বেশি।

সুফল : (১) অ্যালুমিনিয়াম রিসাইক্লিং এর ফলে অ্যালুমিনিয়াম স্ক্রেপ দ্বারা পরিবেশে জঞ্জাল সৃষ্টি হচ্ছে না।

(২) এছাড়া বক্সাইট আকরিক ($Al_2O_3 . 2H_2O$) থেকে বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে Al-ধাতু উৎপাদনে প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ হয়। কিন্তু রিসাইক্লিং এর দ্বারা স্ক্রেপ থেকে Al ধাতু উৎপাদনে যে বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হয়; তা বক্সাইট আকরিক থেকে সমপরিমাণ Al ধাতু উৎপাদনে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের মাত্র 5%।

(৩) এ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ঐ সাশ্রয়ী পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশের যে পরিমাণ দূষণ ঘটতো, তা কম ঘটছে।

(৪) এছাড়া পৃথিবীর সীমিত বক্সাইট আকরিকের ব্যবহার কম হওয়ায় ঐ আকরিক খনিতে জমা বা রিজার্ভ করা আছে।

(৫) বাংলাদেশে Al- ধাতু উৎপাদনের কোনো কারখানা নেই। প্রয়োজনীয় অ্যালুমিনিয়াম বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানি করা হয়। তাই বর্জ্য অ্যালুমিনিয়াম রিসাইক্লিং কারখানা প্রতিষ্ঠা করলে এটি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব রাখবে। এতে অনেক শ্রমিক ও শিক্ষিত যুবকের কর্মসংস্থান হবে।

(৩) কপার রিসাইক্লিং এর গুরুত্ব : উচ্চ তড়িৎ পরিবাহিতা ও রাসায়নিকভাবে কম সক্রিয় হওয়ায় ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক শিল্পে প্রচুর পরিমাণে কপার ব্যবহৃত হয়। তাই কপার স্ক্রেপ ও বর্জ্য কপার সামগ্রী একেবারে কম নয়। বর্তমানে বাংলাদেশসহ প্রত্যেক দেশে অসংখ্য মোবাইল সেট ও কম্পিউটার ব্যবহৃত হলেও সেগুলো অকার্যকর হতে কয়েক বছর সময় নেবে। অন্যদিকে মোবাইল সেটে ও কম্পিউটারে ব্যবহৃত কপার সাধারণ লোকে পৃথক করে নিতে পারবে না। তাই পুরানো মোবাইল সেটের দোকানে ভবিষ্যতে নষ্ট মোবাইল থেকে কপার সংগ্রহ করা হবে। ঐ বর্জ্য কপার রিসাইক্লিং করা সম্ভব হবে।

সুফল : (১) বর্জ্য কপার রিসাইক্লিং করতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি প্রয়োজন এবং অর্থ ব্যয় হয়; কপার পাইরাইটস (Cu_2S, Fe_2S_3) আকরিক থেকে ঐ পরিমাণ কপার উৎপাদন খরচ অনেক গুণ বেশি হয়।

(২) এছাড়া আকরিকের তাপজারণ থেকে সৃষ্ট ফ্লু-গ্যাস SO_2 গ্যাসে থাকায় পরিবেশের অধিকতর দূষণ ঘটে।

(৩) এছাড়া পৃথিবীতে কপার আকরিকের মজুদ সীমিত এবং তা অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা হলে শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। এজন্য কপার রিসাইক্লিং এর অনেক সুবিধা ও গুরুত্ব রয়েছে।

৪। কাচ বা গ্লাস রিসাইক্লিং এর গুরুত্ব : কাচ স্বচ্ছ ও কঠিন পদার্থ; এটিকে গলানোর পর বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করা সম্ভব। সহজলভ্য কাচের সামগ্রী বাসা-বাড়িতে ও অফিসে ব্যবহৃত হয়। বাড়ি ও গাড়ির জানালাতে প্রচুর কাচ ব্যবহৃত হয়। কাচ আঘাতে ভঙ্গুর হওয়ায়, বর্জ্য কাচের পরিমাণ অধিক।

সুফল : (১) বর্জ্য কাচের-ভাঙা সামগ্রী মাটিতে ব্যাকটেরিয়া সংস্পর্শে পচনশীল বা বায়োডিগ্রেডেবল না হওয়ায় বছরের পর বছর পরিবেশে অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ বর্জ্য কাচ পরিবেশের দূষণ ঘটায়।

(২) পরিবেশে ছড়িয়ে থাকা ভাঙা কাচ লোকের স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ। কেননা বাড়ির পরিবেশে লোকের চলাফেরার সময় ও শিশুদের খেলার সময়, এসব ভাঙা কাচে হাত পা কেটে যায়।

(৩) কাচ উৎপাদনের একটি বিশেষ দিক হলো মূল কাঁচামালের সাথে কারখানার ভাঙা কাচ টুকরা ও [illegible] তাই ফেরিওয়ালার সংগৃহীত কাচের টুকরা অটোমেটিকভাবে কাঁচামালের সাথে রিসাইক্লিং এর পর্যায়ভুক্ত হয়।

(৪) বর্তমানে কাচের ভাঙা সামগ্রী ফেরিওয়ালারা সংগ্রহ করে গ্লাস ফ্যাক্টরিতে যোগান দিচ্ছে। এ [illegible] পরিষ্কার করে রিসাইক্লিং এ ব্যবহৃত হচ্ছে। এরূপে কাচ রিসাইক্লিং সামাজিকভাবে ফেরিওয়ালাদের জীবিকা নির্বাহ ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে ভূমিকা রাখে।

৫। পেপার রিসাইক্লিং এর গুরুত্ব : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাগজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সব বইপুস্তক, পত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রভৃতি কাগজে ছাপা হয়। কাগজে লিখে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করে; অন্যরা অফিসের কাজ করে অথবা হিসাব নিকাশ করে। এসব কাজে প্রতিদিন বিশাল পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হয় এবং সময়মতো তা পুরানো কাগজরূপে পরিত্যক্ত হয়। শুধু সংবাদ-পত্রিকা শিল্পে নিউজপ্রিন্টের বার্ষিক চাহিদা হলো এক লক্ষ বিশ হাজার টন; এর মধ্যে আমদানি করতে হয় পঞ্চাশ হাজার টন। বই-পুস্তক, অফিস-আদালত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিউজপ্রিন্টের তুলনায় কয়েক গুণ পরিমাণ উন্নতমানের সাদা কাগজ কর্ণফুলি পেপার মিল যোগান দেয়। দিন, মাস ও বছর শেষে এ সব কাগজ পুরানো বই-পত্র, খাতা, পত্রিকারূপে ফেরিওয়ালারা সংগ্রহ করে। পুরাতন এসব কাগজ থেকে তৈরি হয় দোকানিদের জন্য ঠোঙা এবং অধিকাংশ পুরানো কাগজ রিসাইক্লিং এর জন্য পেপার মিলে ফিরে যায়। এরূপে পুরানো কাগজের রিসাইক্লিং এর সামাজিক গুরুত্ব হলো পুরানো কাগজ সংগ্রহকারী ফেরিওয়ালা ও ঠোঙা তৈরির কাজে যুক্ত লোকদের জীবিকা সংস্থান।

সুফল : (১) কাগজ রিসাইক্লিং পরিবেশ সংরক্ষণ ও গ্রিন হাউজ প্রভাব হ্রাসকরণে ভূমিকা রাখে।

(২) কাগজের রিসাইক্লিং এর ফলে দেশের চাহিদা মিটাতে উদ্ভিদ থেকে কাগজের মণ্ড তৈরির প্রয়োজনীয় পরিমাণ কমে যায়। এক টন কাগজের প্রয়োজনীয় মণ্ড তৈরি করতে প্রয়োজন হয় 17 টি বড় গাছ, 7000 গ্যালন পানি, 380 গ্যালন জ্বালানি তেল এবং 4000 কিলোওয়াট শক্তি।

(৩) অর্থাৎ এক টন পেপার রিসাইক্লিং প্রায় সমপরিমাণ উপাদান ও শক্তি সাশ্রয় করে

(৪) জ্বালানি থেকে সৃষ্ট CO_2 দ্বারা গ্রিন হাউজ প্রভাব মুক্ত পরিবেশ থাকে। তাই উন্নত দেশসমূহে পেপার রিসাইক্লিং গুরুত্বসহকারে কার্যকর রাখে। যেমন 2010 সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 63.5% কাগজ-সামগ্রীকে রিসাইক্লিং করা হয়। বাস্তবে সমগ্র পৃথিবীতে কাগজ রিসাইক্লিং এর পরিমাণ কাচ, প্লাস্টিক ও অ্যালুমিনিয়ামের রিসাইক্লিং এর পরিমাণসমূহের সমষ্টির চেয়েও বেশি হয়।

সুতরাং কাগজ রিসাইক্লিং এর সুফল হলো- (১) জ্বালানি সাশ্রয় হওয়া। (২) বর্জ্য হ্রাস পাওয়া ও (৩) বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস পাওয়া।

৬। প্লাস্টিক রিসাইক্লিং এর গুরুত্ব : বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার সংযোজন পলিমার প্লাস্টিক থেকে তৈরি করা বোতল, চেয়ার, সুতা-ফেব্রিক্স, গ্লু-আঠা, কম্পিউটার ডিস্ক, খাদ্যবস্তুর প্যাকেট, বালতি-গামলা ইত্যাদি সামগ্রী বহুল পরিমাণে বাজারে পাওয়া যায়। এ সব প্লাস্টিক সামগ্রী বাড়ি-ঘরে, দোকানে, অফিসে, বিভিন্ন কর্মস্থলে ও কমিউনিটি সেন্টারে অধিক সংখ্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রস্তুতির পর এসব প্লাস্টিক সামগ্রী সময়ের হিসেবে শ্রেণিভেদে কোনোটি ছয় মাস, কোনোটি বছর বা কোনোটি আরো দীর্ঘসময় পর ব্যবহার শেষে বর্জ্য প্লাস্টিকে গণ্য হয়।

সুফল : (১) বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয় না। অর্থাৎ নন-বায়োডিগ্রেডেবল (non-biodegradable)। তাই-মাটিতে ও পানিতে প্লাস্টিক অপরিবর্তিত থাকে।

(২) এ সব বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যাগ নালা-নর্দমার জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে; পরিবেশের দূষণ ঘটায়।

(৩) এজন্য সরকার প্লাস্টিকের ব্যাগ উৎপাদন নিষিদ্ধ করেছে; অন্যান্য প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন বহাল আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে বর্জ্য প্লাস্টিক রিসাইক্লিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই ফেরিওয়ালারা বর্জ্য প্লাস্টিক সংগ্রহ করে কারখানায় যোগান দিচ্ছে। (১) এতে সামাজিকভাবে ফেরিওয়ালাদের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং (২) পরিবেশের দূষণে ক্রম-হ্রাস ঘটবে। তোমাদের জানা আছে, পলিমার তৈরির মূল উপাদান অ্যালকিন ও প্রতিস্থাপিত অ্যালকিন পেট্রোলিয়াম ক্র্যাকিং থেকে উৎপন্ন করা হয়। (৩) প্লাস্টিক রিসাইক্লিং এর ফলে পেট্রোলিয়াম সাশ্রয় হবে। (৪) পরিবেশ দূষণ কমবে।

শিক্ষার্থীর কাজ :

প্রশ্ন-৫.১৪ : নিচের উদ্দীপকটি অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও। [সি. বো. ২০১৬]

বাঁশ, কাঠ, খড় → পাল্প → বিটিং → রিফাইনিং → শীট তৈরিকরণ (A)

(ক) উদ্দীপকের আলোকে A এর উৎপাদন প্রক্রিয়া সমীকরণসহ লেখ।

(খ) A নামক শিল্প পণ্যটি রিসাইক্লিং পরিবেশ বান্ধব ও অর্থ সাশ্রয়ী; -তা মূল্যায়ন কর।

প্রশ্ন-৫.১৫ : নিচের উদ্দীপকটি অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও। [রা. বো. ২০১৬]

বাঁশ ও কাঠ (A) → কাগজ (B) → ব্যবহৃত কাগজ (C)

(ক) উদ্দীপকের A থেকে B উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(খ) উদ্দীপকের C থেকে B পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

প্রশ্ন-৫.১৬ : বাংলাদেশের রিরোলিং মিলগুলোতে জাহাজের ভাঙ্গা অংশ ও হকারদের মাধ্যমে সংগৃহীত বর্জ্য ধাতব দ্রব্যাদি থেকে একটি ধাতুকে পুনরায় ব্যবহার যোগ্য করা হয়। বর্তমানে ধাতুটির খনি না থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন কাজে ধাতুটি সর্বাধিক বেশি ব্যবহৃত হয়। [কু বো. ২০১৬]

(ক) উদ্দীপকের ধাতুটির রিসাইক্লিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(খ) বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উদ্দীপকের ধাতুটির রিসাইক্লিং জরুরী; এর মূল্যায়ন কর।

৫.১২ ইটখোলার বায়ুদূষণ পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন

To prepare Observation Report on Air-Pollution at a Brick-field

ইটখোলার মাটি হতে ইট তৈরি করা হয়। এ ইট পোড়ানোর জন্য প্রধানত প্রচুর কাঠ, কয়লা ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এ সব জ্বালানি হতে CO, SO_2, নাইট্রোজেন অক্সাইড (প্রধানত (NO_2) প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাস এবং প্রচুর গ্রিন হাউজ গ্যাস CO_2 উৎপন্ন হয়। এ সব বায়ু দূষক চোখে দেখা যায় না; কিন্তু সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে দূষণ মাত্রা মাপা যায়। এ বায়ু দূষক ইটখোলার আশেপাশের অঞ্চলসহ কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে বায়ু প্রবাহের দিক অনুসারে ইট খোলার উঁচু চিমনি থেকে ছড়িয়ে পড়ে; যা পর্যবেক্ষণের আওতায় আসে। বায়ু দূষণের প্রভাব ইটখোলার আশেপাশের গাছপালা ও লতাপাতায় দেখা যায়। পরিবেশ দূষণের মাত্রা ঋতুর ওপর খানিকটা নির্ভর করে। বৃষ্টির পরে বায়ুতে দূষণ মাত্রা কম হয়।

পর্যবেক্ষণের কার্যপদ্ধতি :

(১) শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীরা চারটি দল তৈরি করে নেবে।

(২) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে নিকটবর্তী ইটখোলার মালিক বা সংশ্লিষ্ট লোকের সাথে যোগাযোগ করে পর্যবেক্ষণের তারিখ স্থির করে নেবে।

(৩) দূষক গ্যাসসমূহ যেমন CO, CO_2, SO_2, NO_2 এর মাত্রা মাপার যন্ত্র সম্ভব হলে যোগাড় করে নিবে।

(৪) নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষার্থী-দল ইটখোলায় পৌঁছে ইটখোলার নিকট পরিবেশে এবং নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে বায়ুতে দূষণ মাত্রা পর্যবেক্ষণ করবে। পর্যবেক্ষণ চাক্ষুষভাবে ও যন্ত্রের সাহায্যে করা যাবে। চাক্ষুষভাবে পরিবেশের গাছপালাতে ধুলাবালি জমা, গাছপালার বৃদ্ধি বা বিবর্ণ হওয়া, মরে যাওয়া, ফসলের ওপর প্রভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবে।

(৫) আশেপাশের লোকের সাথে কথা বলে ইটখোলার দূষণে শ্বাসযন্ত্রের রোগ বিস্তার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৬) শিক্ষার্থীর চারটি দল ইটখোলার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম দিক অনুসারে প্রায় ৫০০ মিটার দূরত্বের স্থান পর্যবেক্ষণ করে নিচের তালিকার অনুরূপ তালিকায় পর্যবেক্ষণ তথ্য সংগ্রহ করবে। পর্যবেক্ষণ ফলাফল চতুর্দিক ভিত্তিক পাওয়া যাবে।

পর্যবেক্ষণ ফলাফল উপস্থাপন :

(১) ইটখোলার নাম ও অবস্থান :

(২) পর্যবেক্ষণ তারিখ : বার্ষিক ঋতুকাল :

(৩) পরিদর্শনের ৭ দিন পূর্বে বৃষ্টি হয়েছিল কীনা, তা হলে কয়দিন আগে হয়েছিল ? . . . . . .

(৪) পরিদর্শনের দিক : ইটখোলার পূর্ব/পশ্চিম/ উত্তর/ দক্ষিণ দিক।

(৫) পর্যবেক্ষণের বিষয় : বায়ুতে দূষক গ্যাসের পরিমাণ ও পরিবেশের ওপর প্রভাব

পর্যবেক্ষণ স্থান ইটখোলা থেকে দূরত্ব	গাছপালার ওপর প্রভাব	লোকের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব	CO এর পরিমাণ ppm	NO_2 এর পরিমাণ ppm	SO_2 এর পরিমাণ ppm	CO_2 এর পরিমাণ ppm	মন্তব্য
১। ইটখোলার 100 মিটার দূরত্বে :	...	...	...	...	...	...	...
২। ইটখোলার 200 মি. দূরত্বে	...	...	...	...	...	...	...
৩। ইটখোলার 300 মি. দূরত্বে	...	...	...	...	...	...	...
৪। ইটখোলার 400 মি. দূরত্বে	...	...	...	...	...	...	...
৫। ইট খোলার 500 মি. দূরত্বে	...	...	...	...	...	...	...

৫.১৩ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সুবিধা-অসুবিধা

Advantage and Disadvantage of Coal-based Power Plant

কয়লা দহনকালে রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ তাপশক্তি দ্বারা পানিকে বাষ্পে পরিণত করা হয়; যা টারবাইনকে ঘুরায়, এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুবিধা ও অসুবিধা কীরূপ তা আমরা আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারব।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। তাই এদেশে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও প্রাকৃতিক গ্যাস-পেট্রোলিয়ামভিত্তিক বিদ্যুৎ -কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ দিয়ে দেশের বিদ্যুৎ -চাহিদা মিটানো যাচ্ছে না। এর ফলে শিল্পক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ হাজার মিলিয়ন টনের মতো উন্নত মানের কয়লা মজুদ আছে। অথচ এ কয়লা অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। তাই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করে বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করা যাবে। আবার গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে ঐ প্রাকৃতিক গ্যাসকে ইউরিয়া উৎপাদনে ব্যবহার করা সমীচিন হবে। জানা মতে, পৃথিবীতে বর্তমানে 50,000 এর বেশি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রে সে দেশের উৎপাদিত বিদ্যুতের 55% হলো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ। তাই পরিবেশ দূষণের সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবে রেখে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে দেশের কয়লা সম্পদকে দেশ উন্নয়নে কাজে লাগানোই যুক্তিযুক্ত।

(ক) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে সুবিধাসমূহ :

(১) সহজলভ্য জ্বালানি : পৃথিবীর প্রায় সব দেশে কম-বেশি কয়লার খনি আছে। বাংলাদেশেও এ যাবৎ পাঁচটি কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লার খনি থেকে দৈনিক 650 টন কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ বছরের চাহিদা পূরণের কয়লার মজুদ আছে।

(২) কয়লা থেকে প্রাপ্ত তাপশক্তি : কয়লার দহনে প্রচুর তাপশক্তি পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি ভিত্তিক ক্ষমতা (efficiency) হলো :

শক্ত কয়লা (hard coal)⟶ 42%, পেট্রোলিয়াম তেল⟶ 44%, প্রাকৃতিক গ্যাস ⟶57%, নিউক্লিয়ার পাওয়ার ⟶ 34%। সুতরাং নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের তুলনায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেশি।

[আবার 2014 সালের USEIA(energy information administration) প্রদত্ত তথ্য মতে ঐ বছরে বিশ্বে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন জ্বালানির অবদান হলো : কয়লা ⟶ 34%, প্রাকৃতিক গ্যাস⟶ 22%, পানি বিদ্যুৎ ⟶ 17% পারমাণবিক উৎস ⟶ 11%, তেল⟶5%, অন্যান্য উৎস (বায়ু, সৌর)⟶ 7%]। প্রতি বৎসর বিশ্বে কয়লা থেকেই অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

(৩) কাঁচামালের মূল্য : কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল জ্বালানি হলো কয়লা। অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় বিশ্বে কয়লার দাম কম। তাই কয়লা থেকে প্রাপ্ত তাপশক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হলে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ অন্য জ্বালানি যেমন তেল অথবা প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনায় কম হবে।

(৪) পরিবহন সুবিধা : কয়লা কঠিন জ্বালানি হওয়ায় কয়লার পরিবহন নিজ দেশে অথবা বিদেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে সহজ হবে। এক্ষেত্রে স্থল পথে ট্রেন, ট্রাক এবং জলপথে জাহাজে করে কয়লা পরিবহন খরচ কম পড়বে।

(৫) জ্বালানি দহনের চুল্লি : কয়লার দহনে ব্যবহৃত চুল্লি তৈরিতে খরচ কম হয় এবং চুল্লি তৈরি করা সহজ। তাই কয়লার দহনে সহজে তাপশক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

(৬) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে স্থান নির্বাচন : কয়লার পরিবহন সুবিধার দিক বিবেচনা করে এবং প্রাকৃতিক দূষণ ঘটার সম্ভাব্যতা অগ্রাধিকার দিয়ে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন বাংলাদেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে খুবই উপকারী শক্তি উৎপাদন প্রকল্প হবে।

(৭) কর্মসংস্থান সৃষ্টি : প্রতিটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে দেশের জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পও একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান। তাই এ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সহকারী অঙ্গ সংগঠনগুলোতে হাজারো লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বাংলাদেশের জনগণের জন্য অনেক সুবিধা বয়ে আনবে।

(ক) কয়লার খনি থেকে কয়লা উত্তোলন ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে যে সব অসুবিধা

(i) ভূমি ক্ষয় ও পানি দূষণ : খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের ফলে চারদিকের ভূমির ক্ষয় বা ইরোশন (erosion) ঘটে। এর সাথে কয়লা খনির বিষাক্ত পদার্থ নিকটবর্তী নদী ও জলাশয়ে গিয়ে পানির দূষণ ঘটায়। ফলে নিকটবর্তী জনবসতির ও কৃষি জমির ক্ষতি হয়। জনবসতির স্থান পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হয়।

(ii) পরিবেশ দূষণ : কয়লাভিত্তিক তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এই উত্তোলিত কয়লার দহনে সৃষ্ট তাপ পরিশেষে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কয়লার মূল উপাদান কার্বন হলেও কয়লার মধ্যে বিভিন্ন অ্যারোমেটিক যৌগ ও বিভিন্ন পদার্থ থাকে। এ সব পদার্থকে সহজে পৃথক করা যায় না। তাই কয়লার দহনকালে বায়ুদূষক CO, CO_2, SO_2 ও NO_x প্রভৃতি গ্যাস এবং ক্ষুদ্রকণা কঠিন বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। **ফলে পরিবেশের অপূরণীয় দূষণ ঘটে।** 2008 সালে ইউরোপিয়ান পরিবেশ একাডেমি (European Environment Agency বা EEA) বিভিন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে নিম্নলিখিত তথ্য সংকলন করে; (সারণি ৫.৬)।

সারণি–৫.৬ : EEA পর্যবেক্ষণভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সৃষ্ট বায়ুদূষক :

[গ্রাম পার জিগা জুল এককে (g/GJ), $1GJ = 1\times10^9$ J]

বায়ু দূষক	শক্ত কয়লা (Hard Coal)	বাদামি কয়লা (Brown Coal)	ফুয়েল অয়েল (Fuel Oil)	অন্যান্য জ্বালানি তেল	প্রাকৃতিক গ্যাস
CO_2	94,600.00	101,000	77,400	74,100	56,100
SO_2	765.00	1,361	1,350	228	0.68
NO_x	292.00	183.00	195.00	129.00	93.30
CO	89.10	89.10	15.70	157.00	14.50
বিভিন্ন জৈব যৌগ, (CH_4 বাদে)	4.92	7.78	3.70	3.24	1.58
বায়ুবাহিত কণাবস্তু	1,203	3,254	16.0	1.91	0.10

(iii) গ্রিন হাউজ গ্যাস ও অম্লধর্মী গ্যাস নির্গমন : প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনায় যে কোনো শ্রেণির কয়লাভিত্তিক তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নির্গত বায়ু দূষকের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। **বিশেষ করে গ্রিন হাউজ গ্যাস CO_2 নির্গমনের পরিমাণ সর্বাধিক। বায়ুবাহিত কণাবস্তু ও অম্লধর্মী SO_2 ও NO_x শ্বাসতন্ত্রের রোগ সৃষ্টি করে। এ সব অম্লধর্মী গ্যাস এসিড-বৃষ্টি ঘটায়।** ফলে জমির উর্বরতা-নষ্ট, গাছপালার ক্ষতি, জলাশয়ের পানির pH-3 পর্যন্ত কমে আসে। ফলে জলজ উদ্ভিদ ও মাছ মারা যায়। এসব পরিবেশ দূষণের কারণে পরিবেশবাদীরা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে আপত্তি তোলে।

(iv) উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন : এক্ষেত্রে কয়লা উত্তোলন, স্থানান্তর ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রয়োজন হয়। বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি ও পরিবহনের জন্য **কম খরচে পরিবহন ব্যবস্থা থাকা দরকারি হয়।**

(v) ফ্লাইঅ্যাশ (ছাই) : কয়লার দহনের পর অবশেষ রূপে যথেষ্ট ছাই উৎপন্ন হয়। ক্ষেত্র বিশেষে এ ছাইয়ের পরিমাণ 30–35 ভাগ হয়ে থাকে। এ বিপুল পরিমাণ ছাই-সংরক্ষণের স্থানাভাবের ফলে নদী বা সাগরে বর্জ্যরূপে ফেলে দিলে পরিবেশের অশেষ ক্ষতি হয়।

MCQ-5.11: কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন আমাদের দেশের জন্য লাভজনক হলেও সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো হলো (i) কয়লা খনি অঞ্চলে ভূমির ক্ষয়, (ii) বাতাসে ধাতব অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি, (iii) কঠিন বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়া,

কোনটি সঠিক হবে?

(ক) (i) ও (ii) (খ) (i) ও (iii) (গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

৫.১৪ ন্যানো পার্টিকেল ও ন্যানো প্রযুক্তির প্রাথমিক ধারণা
Nano-particles and Primary Concept of Nano-technology

'ন্যানো' কণা : 'ন্যানো' শব্দের সাধারণ অর্থ হলো 'খুবই ক্ষুদ্র'; যেমন, সংখ্যার একক মানের 1×10^{-9} বোঝায় এবং মিটার এককে এর প্রতীক হলো $1nm = 10^{-9}m$। ন্যানোস্কেল সিস্টেম বলতে ক্ষুদ্রতম কণার প্রস্থ 1nm থেকে 50 nm পরিসরকে বোঝায়।

'ন্যানো' কণার শ্রেণিবিভাগ :

(১) ন্যানো-লেয়ার (nanolayer) : ন্যানো স্কেল মতে One dimension বা **একমাত্রিক** বা রৈখিক বস্তুকণার পরিসর (range) 1nm –100 nm হলে, এদেরকে **ন্যানো-লেয়ার** (nanolayer) বলে।

(২) ন্যানো-টিউব : ন্যানো স্কেল মতে, 1nm– 100 nm এর **দ্বিমাত্রিক** (বা two dimensions) ক্ষুদ্রকণার নাম হলো **ন্যানো-টিউব বা ন্যানো-ওয়্যার** (nanotube বা, nanowire) ।

(৩) ন্যানো পার্টিকেল : ন্যানো স্কেল মতে, 1nm –100nm এর **ত্রিমাত্রিক ক্ষুদ্রকণাকে ন্যানো পার্টিকেল** বলে।

★ ন্যানোমিটারের ধারণা মতে, চারটি H পরমাণু পাশাপাশি রাখলে 1nm হয়।

★ একটি সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার দৈর্ঘ্য হলো প্রায় 1000 nm এবং

★ মানুষের একটি চুলের ব্যাস হলো প্রায় 50,000 nm.

বর্তমানে আধুনিক যুগে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ন্যানোস্কেলভিত্তিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানার জন্য নিত্য নতুন ন্যানো প্রযুক্তির উদ্ভাবনে সচেষ্ট আছেন।

ন্যানো প্রযুক্তি : ন্যানো প্রযুক্তি বা Nanotechnology বলতে ন্যানোস্কেলভিত্তিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভিন্ন কণাবস্তু যেমন 1nm থেকে 100nm এর কম দৈর্ঘ্যের কণাবস্তুর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি এবং এদের প্রস্তুতির প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে বোঝায়। এ টেকনোলজিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, বায়োলজি, মেডিসিন, বস্তুবিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন শাখার গবেষকরা গবেষণা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আশা করা যায়, নিকট ভবিষ্যতে এ ন্যানো টেকনোলজি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি **আন্তঃসুশৃঙ্খল বিজ্ঞান** (inter-disciplinary science) রূপে প্রতিষ্ঠা পাবে।

৫.১৫ পরমাণু, অণু ও ন্যানো পার্টিকেলের তুলনা
Comparison Among Atom, Molecule and Nanoparticle

তোমরা রসায়নের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ-৩.৩ এর চিত্র-৩.১০-এ দেয়া বিভিন্ন মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সম্বন্ধে পিকো মিটার (pm) এককে তুলনামূলক ধারণা পেয়েছ। ঐ চিত্র-৩.৭-এ দেয়া H এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ হলো 37pm। তাই H এর পারমাণবিক ব্যাস হলো এর দ্বিগুণ অর্থাৎ $37pm \times 2 = 74pm = 0.074$ nm; অপরদিকে সবচেয়ে বড় আকারের পরমাণু Cs এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ হলো 265 pm অর্থাৎ Cs এর পারমাণবিক ব্যাস $= 265$ pm $\times 2 = 530$ pm $= 0.530$ nm। তাই আমরা জানলাম, **পরমাণুসমূহের পারমাণবিক ব্যাস 0.074 nm থেকে 0.53 nm এর মধ্যে থাকে। অপরদিকে ন্যানো পার্টিকেলসমূহের আকার 1nm থেকে 100 nm এর মধ্যে থাকে।**

ন্যানো পার্টিকেল-এর বৈশিষ্ট্য হলো :

(i) ন্যানোকণা : H পরমাণুর পারমাণবিক ব্যাসের তুলনায় ন্যানোকণা : 13 থেকে 1300 গুণ আকারে বড় এবং Cs এর তুলনায় প্রায় 33 গুণ বড় থাকে।

(ii) UV রশ্মিতে ন্যানোকণা দৃশ্যমান হয়,

(iii) দৃশ্যমান বস্তুতে ন্যানো কণা দেখা যায় না।

অপরদিকে অণু গঠিত হয় একাধিক পরমাণুর রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে। অণুতে পরমাণুগুলো বিভিন্ন দিকে অবস্থানের কারণে অণুসমূহের আকার আকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন CO_2 অণুর আকৃতি রৈখিক, H_2O অণুর আকৃতি 'V' এর ন্যায়, CH_4 হলো চতুস্তলকীয় এবং SF_6 অণু অষ্টতলকীয়। অণুর আকার নির্ভর করে অণুতে যুক্ত থাকা পরমাণু সংখ্যা ও এদের ত্রিমাত্রিক বিন্যাসের ওপর। অণুতে পরমাণুর সংখ্যা যতো বেশি হয় অণুর আকারও ততো বড় হয়। তবে পরমাণুসমূহের পারমাণবিক ব্যাস 0.074 nm থেকে 0.53nm হওয়ায় এদের দ্বারা সৃষ্ট **অণুসমূহের প্রস্থ বা দৈর্ঘ্য 1nm থেকে 2nm এর বেশি হয় না।**

চিত্র ৫.১০ : ফুলারিন ও ন্যানোটিউব।

এছাড়া **দৈত্যাকার অণুর** (giant molecules) মধ্যে SiO_2, SiC ও হীরক ইত্যাদি রয়েছে। এদের অণুতে কোটি-কোটি পরমাণুযুক্ত থাকে। তাই সে অনুসারে এদের আকার সাধারণ অণু থেকে এবং ন্যানো পার্টিকেল থেকেও বড় হয়। এছাড়া উচ্চ আণবিক ভরবিশিষ্ট পলিমার অণুসমূহের আকার সাধারণ অণুর তুলনায় অনেক বড় হয়। দৈত্যাকার অণু ও পলিমার অণুসমূহ স্থূল অণু বা bulk materials এর মধ্যে পড়ে। **দৈত্যাকার অণুসমূহের** আকার মাইক্রো মিটার বা মাইক্রন (10^{-6}m) এককে প্রকাশ করা হয়।

ন্যানো কণা, পরমাণু ও অণুর মধ্যে তুলনা : ন্যানো পার্টিকেলের আকারগত অবস্থান হলো পরমাণু ও সাধারণ অণু থেকে বড়; কিন্তু স্থূল বস্তু (bulk materials) বা মাইক্রো অণুর ($d = 10^{-6}$m) তুলনায় 10 থেকে 1000 গুণ ছোট।

কার্বনের ন্যানো কণা : কার্বন হতে সৃষ্ট ন্যানো পার্টিকেলের মধ্যে **ফুলারিনসমূহ** (fullerines) যেমন C_{32}, C_{50}, C_{60}, C_{70} উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে বুকমিনস্টার ফুলারিন বা 'বাকি বল' C_{60} এর আকার ফুটবলের মতো।

কার্বনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ন্যানো পার্টিকেল হলো **গ্রাফিন** (graphene); এটি কার্বনের এক স্তরবিশিষ্ট এবং এর গঠন হলো গ্রাফাইট শিটের মতো।

কার্বনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ন্যানো পার্টিকেল হলো **কার্বন ন্যানোটিউব**; এটি গ্রাফিন স্তরের টিউব আকার এবং এক প্রান্তে ফুলারিনের অর্ধেক গঠন সমন্বয়ে গঠিত। এর ব্যাস 2nm – 30nm হয় এবং দৈর্ঘ্য কয়েক mm হয়ে থাকে। একটি টিউবের মধ্যে পর পর অনেকগুলো ন্যানোটিউব থাকে। (চিত্র – ৫.১০)।

* **বিশ্বের সবচেয়ে ছোট টেস্টটিউব হিসেবে পরিচিত টেস্টটিউব হলো কার্বন ন্যানো টিউব।** এ টিউবের আয়তন হলো 1×10^{-24} dm^3। কিন্তু ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে **সবচেয়ে দীর্ঘ কার্বন ন্যানো টিউব তৈরি করা হয়, যার দৈর্ঘ্য হলো 18.5 cm.**

কার্বনের চল্লিশটির বেশি বহুরূপ (allotropes) এর মধ্যে তিনটি কেলাস গঠনযুক্ত বহুরূপ হলো হীরক বা ডায়মন্ড, গ্রাফাইট ও ফুলারিনস। **হীরক বিদ্যুৎ অপরিবাহী হলেও গ্রাফাইট বিদ্যুৎ সুপরিবাহী।** হীরকে C- পরমাণু sp^3 সংকরিত ও চতুস্তলকীয়ভাবে প্রতিটি C- পরমাণু অপর চারটি C- পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে সবচেয়ে শক্ত ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী গঠন তৈরি

করে। হীরকে কোনো মুক্ত বা সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন থাকে না বলে হীরক বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে না। গ্রাফাইটে প্রতিটি C- পরমাণু sp^2 সংকরিত সুষম ত্রিকোণাকারভাবে প্রতিটি C- পরমাণুর অপর তিনটি C-পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকে। অসংকরিত $2p_z^1$ অরবিটাল ইলেকট্রনটি সঞ্চরণশীল থাকে। গ্রাফাইটের মতো, ফুলারিনেও প্রতিটি C- পরমাণু sp^2 সংকরিত থাকে। সঞ্চরণশীল $2p_z^1$ ইলেকট্রনের কারণে **গ্রাফাইট, ফুলারিন ও কার্বনের ন্যানো পার্টিকেল বিদ্যুৎ সুপরিবাহী হয়।**

৫.১৬ পদার্থের স্বাভাবিক অবস্থা ও ন্যানো কণার ভৌত ধর্মের তুলনা

Comparison of Physical Properties between Nanoparticles & Normal State of Matter

পদার্থের স্বাভাবিক অবস্থায় বস্তুর স্থূলতা বা পরিমাণ ভৌত ধর্মকে প্রভাবিত করে না; কিন্তু ন্যানো পার্টিকেলের আকার ছোট বা বড় হলে এদের ভৌত ধর্মসমূহে বিশেষত অপটিকেল (optical), চুম্বকীয় (magnetic), বৈদ্যুতিক (electrical), যান্ত্রিক (mechanical) ইত্যাদি ধর্মে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। এর মূলে রয়েছে ন্যানো কণার তলের ক্ষেত্রফল (surface area) পদার্থের স্বাভাবিক স্থূল অবস্থা থেকে অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। যেমন,

(i) সাধারণ অবস্থায় সোনার বর্ণ হলো সোনালী হলুদ এবং সিলিকন হলো ধূসর বর্ণের। কিন্তু ন্যানো আকারে সোনার ও সিলিকনের বর্ণ হলো লাল।

(ii) সাধারণ অবস্থায় স্বর্ণের গলনাঙ্ক হলো 1064°C; কিন্তু 2.5 nm আকারের স্বর্ণের গলনাঙ্ক হয় প্রায় 300°C।

(iii) ফটোভোল্টিক সেলে (Photovoltic cell-এ) সৌর রশ্মির শোষণের পরিমাণ ঐ সেলের ভেতরের পদার্থের আকারের ওপর নির্ভর করে। এতে সাধারণ অবস্থার পদার্থ যে পরিমাণ সৌর রশ্মি শোষণ করে; ন্যানো কণা যত ছোট হয় ততো বেশি পরিমাণে সৌর রশ্মি শোষণ করতে পারে।

(iv) আবার ZnO স্বাভাবিক অবস্থায় UV রশ্মি যে পরিমাণ প্রতিহত করে এর চেয়ে ন্যানো কণা অবস্থায় ZnO অনেক বেশি UV রশ্মি প্রতিহত করে। এজন্য ZnO ন্যানো কণা অবস্থায় 'Sun-screen lotion' তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(v) সাধারণত অদ্রবণীয় কঠিন বস্তুর গুঁড়া তরল পদার্থে মিশ্রিত করলে ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে ঐ কঠিন বস্তুর গুঁড়া তরলে ভাসবে অথবা তলায় পড়ে জমা হবে। কিন্তু ন্যানো স্কেলের সূক্ষ্ম গুঁড়া বিস্তারণ বল, আয়ন ডাইপোল সম্পর্ক মতে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সাসপেনশন অবস্থায় থাকে।

(vi) ন্যানো কণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভৌতধর্ম হলো চুম্বকীয় ধর্ম ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ধর্ম। যেমন ফেরো-ইলেকট্রিক কঠিন পদার্থ 10 nm এর ছোট আকারে থাকলে কক্ষ তাপমাত্রার তাপীয় শক্তি ব্যবহার করে সুপার প্যারা ম্যাগনেটিজম ধর্ম প্রকাশ করে। তখন এসব ন্যানো পার্টিকেল মেমোরি স্টোরেজ (memory storage)-এর অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই সব সময় এরূপ ধর্ম ন্যানো পার্টিকেলে সুবিধাজনক বা কাম্য নয়। অনেক ন্যানো কণা বিশেষত গ্রাফিন ও কার্বন ন্যানো টিউব সাধারণ গ্রাফাইটের তুলনায় অনেক বেশি বিদ্যুৎ সুপরিবাহী হয়।

MCQ-5.12 : ন্যানো অবস্থায় পদার্থের অপটিকেল, চুম্বকীয় বা বৈদ্যুতিক ধর্মে পরিবর্তন ঘটার প্রধান কারণ কোন্‌টি?
(ক) কণার ভর (খ) কণার আয়তন
(গ) কণার ভৌত অবস্থা (ঘ) কণার তলের ক্ষেত্রফল

৫.১৭ শিল্পে ন্যানো পার্টিকেল ব্যবহারের সম্ভাবনা

Probability of Nanoparticles' Uses in Industries

ন্যানো পার্টিকেল সংক্রান্ত গবেষণায় এদের বেশ কিছু উৎসাহব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য ও সফল ব্যবহার আবিষ্কৃত হওয়ায় এর মধ্যেই ন্যানো পার্টিকেল বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এদের ব্যবহার কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। এর মূলে রয়েছে পদার্থের ভর অনুসারে স্বাভাবিক গুঁড়া অবস্থার পৃষ্ঠতলের তুলনায় ন্যানো কণার পৃষ্ঠতলের সর্বাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি। বর্তমানে ন্যানোকণার উল্লেখযোগ্য ব্যবহারসমূহ হলো নিম্নরূপ :

(ক) সাধারণ শিল্পক্ষেত্রে ন্যানো কণার ব্যবহার :

(১) **ন্যানো প্রভাবক :** শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য d-ব্লকের অবস্থান্তর ধাতু ও এদের যৌগ প্রভাবকরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রভাবনের সুফল বা **প্রভাবকের দক্ষতা** প্রভাবকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের ওপর নির্ভর করে। যেহেতু ন্যানো কণার পৃষ্ঠতলের পরিমাণ সর্বাধিক হয়; তাই শিল্পে ন্যানো কণার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে সিরামিকের ওপর প্রভাবক ধাতুর ন্যানো কণা তৈরি করে, এর থেকে অধিক সুফল পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, পানি-বাষ্প ও CO গ্যাস মিশ্র থেকে H_2 গ্যাস উৎপাদনে কার্বন ন্যানো টিউবে প্রবিষ্ট স্বর্ণ ন্যানোকণা অত্যন্ত কার্যকর বিজারকরূপে ব্যবহৃত হয়।

$$H_2O(g) + CO(g) \xrightarrow{C,\ Au} H_2(g) + CO_2(g)$$

অনুরূপভাবে, ZnO এর ন্যানো কণা (3nm – 5nm) শক্তিশালী জারকরূপে CCl_4 কে জারিত করে CO_2 এ পরিণত করে।

$$2ZnO + CCl_4 \rightarrow CO_2 + 2ZnCl_2$$

(২) **পানি বিশোধন :** পানি হতে বিভিন্ন অপদ্রব্য দূর করার কাজে অর্থাৎ **পানি বিশোধনের ক্ষেত্রে** ন্যানো কণার আয়রন ব্যবহার নিয়ে গবেষণায় সুফল পাওয়া গেছে। অনতিবিলম্বে এটি বাজারে আসতে পারে। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) দ্বারা **দূষিত পানিকে** বিশোধনে আয়রন ন্যানো কণা এবং নলকূপের পানিতে থাকা **আর্সেনিক দূর করতে আয়রন অক্সাইড** ন্যানো কণা ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৩) **ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক :** কাপড়, খাদ্যদ্রব্য প্যাকেজিং ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ ও দুর্গন্ধ দূর করার জন্য ন্যানো সিলভার ব্যবহার শুরু হয়েছে।

(৪) **উচ্চ টাওয়ার তৈরিতে :** ধাতুর কণার আকার হ্রাসের সাথে **'ধাতুর ফাইবার'**–এর শক্তি বা strength বৃদ্ধি পায় এবং তা 50nm –100 nm দৈর্ঘ্যের মধ্যে সর্বাধিক হয়। তাই সাধারণ ফাইবারের তুলনায় ন্যানো ফাইবারের শক্তি বেশি। এ কারণে ন্যানো ফিলামেন্ট, ন্যানো মেটেল রড, ন্যানো কার্বন টিউব বা ন্যানো ওয়্যার (Wire) দ্বারা তৈরি কম্পোজিট সিস্টেম অসাধারণ শক্তিশালী হয়। অতি উচ্চ টাওয়ার তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজির প্রয়োগ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৫) **চিকিৎসা ক্ষেত্রে :** মেডিসিনে ন্যানো কণার ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা চলছে। ক্যান্সার চিকিৎসায় এর মধ্যে কেমোথেরাপিতে ন্যানোকণার ব্যবহার কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

(৬) **মোটর ইঞ্জিনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে :** গাড়ির ইঞ্জিন সিলিন্ডারে জিরকোনিয়াম অক্সাইড (ZrO_2), অ্যালুমিনা (Al_2O_3) ও নিকেলাইট (NiAs) দ্বারা প্রলেপ দিয়ে এবং ইঞ্জিনের কার্বুরেটরের ওপর নিকেল-ক্রোমিয়াম (Ni–Cr) ধাতুসংকরের ন্যানো কণার প্রলেপ দিয়ে জ্বালানি-গ্যাসের চাপশক্তি বৃদ্ধি করা যায়। এছাড়া ইঞ্জিনের ডিস্ট্রিবিউটর ও কার্বন প্লাগের ওপর কার্বনের ন্যানো কণার প্রলেপ দিয়ে ব্যবহৃত তড়িৎ শক্তির প্রবাহকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়। এর ফলে মোটর ইঞ্জিনের দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়।

(খ) বৈদ্যুতিক শিল্পে ন্যানো কণার ব্যবহার :

(১) **কার্বন ন্যানো টিউবের বিদ্যুৎ পরিবহন দক্ষতা** অসাধারণ। এজন্য ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতিতে **ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট** তৈরিতে কার্বনের ন্যানো টিউব-এর মধ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এর ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পাবে।

(২) ন্যানো কণা দ্বারা **সেমিকনডাক্টর** (semi conductor) তৈরি করা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক শিল্পে এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির অ্যানোডকে সিলিকন ন্যানো পার্টিকেল কোটিং দিলে ঐ ব্যাটারির পাওয়ার বেড়ে যায় এবং রিচার্জ করার সময় কম লাগে।

(৩) ন্যানো কণার বিশেষ চুম্বক ধর্মের কারণে কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রে **মেমোরি সংরক্ষক** তৈরির কাজে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

(৪) সৌর শক্তি হতে বিদ্যুৎ তৈরির ফটোসেলে ন্যানো পার্টিকেলের ব্যবহার **ফটোসেলের দক্ষতা** অনেক বৃদ্ধি পায়। তাই ফটোসেল তৈরিতে ন্যানো কণার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(গ) অপটিকেল ক্ষেত্রে ন্যানো কণার ব্যবহার :

(১) ন্যানো কণা অবস্থায় ZnO এর UV রশ্মি প্রতিহত করার ক্ষমতা অনেকগুণ বেড়ে যায়; তাই **সানস্ক্রিন লোশন** (sun-screen lotion) তৈরিতে ZnO এর ন্যানো কণা ব্যবহৃত হচ্ছে। অনুরূপভাবে, টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড TiO_2 এর ন্যানো কণা সানস্ক্রিন লোশনে বা ক্রিম ব্যবহৃত হয়

(২) শত সহস্র পরমাণুর 1nm – 10 nm ব্যাসের সেমিকন্ডাক্টর 'কোয়ান্টাম-ডটস্' (quantum dots) নামক ন্যানো পার্টিকেলে বিশেষ ইলেকট্রনিক প্রভাব প্রকাশ পায়। এরূপ আকারের 'কোয়ান্টাম-ডট' নামক সেমিকন্ডাক্টরের ওপর UV রশ্মি আপতিত হলে ঐ সব ন্যানো কণার আকারের ওপর নির্ভর করে দৃশ্যমান আলোর পরিসরে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন বর্ণযুক্ত আলো ঐ সব ন্যানো কণা থেকে বিকিরিত হয়। যেমন,

3 nm ক্যাডমিয়াম সেলেনাইড কণা UV রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে 520 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সবুজ বর্ণের আলো এবং ঐ একই পদার্থের 5.5 nm এর বড় আকারের কণা 620 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল বর্ণের আলো বিকিরণ করে। অর্থাৎ একই পদার্থের এরূপ 'কোয়ান্টাম-ডট' এর আকার ছোট হওয়ার সাথে এরা UV রশ্মিকে দৃশ্যমান আলোর বর্ণালির পরিসরে লাল (red) বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যে এবং এর ক্রম হ্রাস করে সর্বশেষ বেগুনি (violet) বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফুটিয়ে তুলতে পারে।

প্রাণিকোষের চেয়ে সহস্রগুণ ছোট এসব কোয়ান্টাম-ডট ন্যানো কণার এরূপ অপটিকেল ধর্মের কারণে কোষের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বায়ো-অণুর শনাক্তকরণ, এদের গতি-ধারা অনুসন্ধান (tracking) ও এদের বিভিন্ন বর্ণের ইমেজিং কাজে এ সব ন্যানো কণা বর্তমানে ব্যবহৃত হয়। ছোট আকারের এসব ন্যানো কণা ক্যান্সার কোষের মেমব্রেন ভেদ করে কোষে প্রবেশ করতে পারে। MRI Contrast agent যেমন প্যারাম্যাগনেটিক গ্যাডোলিনিয়াম আয়ন, Gd^{3+} এ কোয়ান্টাম ডট কণা যুক্ত করে উন্নত MRI ইমেজ পাওয়া যায়। ফলে প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার শনাক্তকরণ ও সুফলদায়ক চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ :

প্রশ্ন- ৫.১৭। (ক) ন্যানো-পার্টিকেল কী? [কু.বো. য.বো. দি. বো. ২০১৫]

(খ) ন্যানো-পার্টিকেলের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

(গ) গ্রাফিন কী? এর ব্যবহার লেখ।

(ঘ) ZnO এর ন্যানো কণার ব্যবহার লেখ।

(ঙ) কোয়ান্টাম ডটস কী? এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

(চ) বৈদ্যুতিক শিল্পে ন্যানো কণার ব্যবহার লেখ।

এ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ (Recapitulation)

* **প্রাকৃতিক গ্যাস :** ভূপৃষ্ঠের নিচে বিভিন্ন গভীরতায় শিলাস্তরের মধ্যে সঞ্চিত পেট্রোলিয়াম খনিজ তেলের উপরিভাগে মিথেন, ইথেন, প্রোপেন ও বিউটেন গ্যাস সঞ্চিত থাকে। এ গ্যাস মিশ্রণকে প্রাকৃতিক গ্যাস বলে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসে 95% – 99% মিথেন থাকে।

* **বিটুমিনাস কয়লা :** এটি উন্নত মানের কয়লা। এতে যুক্ত কার্বনের শতকরা পরিমাণ প্রায় 50% এবং জলীয় বাষ্প 10–12% পর্যন্ত থাকে। দহনের পর ছাই কম থাকে।

* **বিটিইউ (BTU) :** এক পাউন্ড পানির তাপমাত্রা 1°F বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণকে এক BTU বলা হয়। 1BTU = 1055J. এটি খনিজ কয়লার মান নির্ণয়ের একটি একক। এটি এক পাউন্ড কয়লাকে দহনের পর উৎপন্ন তাপের পরিমাণ প্রকাশ করে। BTU এর মান যত বেশি হবে কয়লার মান ততো উন্নত হবে।

* **গ্লেজিং (Glazing) :** সিরামিক সামগ্রী পোড়ানোর পর শক্ত, ভঙ্গুর ও সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত (porous) হয়ে থাকে। গ্লেজিং দ্বারা ঐ সিরামিক সামগ্রীর ওপর কাচের মূল উপাদান ছিটিয়ে এবং পরে উত্তপ্ত করে গলিত কাচের পাতলা আবরণ সৃষ্টি করে সূক্ষ্ম ছিদ্র বন্ধ ও তলকে মসৃণ করা হয়। এ প্রক্রিয়াকে সিরামিক গ্লেজিং বলে। লবণ ছিটিয়েও তা করা যায়। তখন সোডিয়াম সিলিকেট দ্বারা সূক্ষ্ম ছিদ্র বন্ধ হয়।

* **সেলুলোজ ফাইবার :** সেলুলোজ ফাইবার হলো উদ্ভিদের দেহ কাঠামো তৈরির প্রাকৃতিক পলিস্যাকারাইড বা প্রাকৃতিক পলিমার। গ্লুকোজ থেকে β গ্লাইকোসাইড বন্ধন দ্বারা এটি তৈরি হয়। এটি পানিতে অদ্রবণীয়।

* **লিগনিন (Lignin) :** প্রাকৃতিক শাখাযুক্ত পলিমার। সেলুলোজ ফাইবারসমূহকে লিগনিন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখে। এক্ষেত্রে H-বন্ধন ও ডাইসালফাইড বন্ধন থাকে।

* **ক্লিংকার (Clinker) :** সিমেন্টের উপাদানসমূহকে রোটারি ফার্নেসে 1400°– 1600°C তাপমাত্রায় তাপজারণ বা Calcination শেষে গলিত ক্যালসিয়াম সিলিকেট ও ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট মিশ্রণ পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা অবস্থায় ছোট ছোট কঠিন টুকরা অবস্থায় চুল্লি থেকে বের হয়, এটি সিমেন্ট ক্লিংকার নামে পরিচিত। এর সাথে 3–5% জিপসাম গুঁড়া মিশিয়ে সূক্ষ্ম গুঁড়া করলে সিমেন্ট পাওয়া যায়।

* **কিউরিং (Curing) :** কাঁচা চামড়ার ওপর লবণ ছিটিয়ে চামড়ার পানিকে বের করা হয়। এ প্রক্রিয়াকে কিউরিং বলে। এতে অসমেটিক চাপ ক্রিয়াশীল থাকে। এর ফলে চামড়ায় ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পচনরোধ হয়।

* **FGD প্ল্যান্ট :** কারখানার চিমনি দিয়ে নির্গত গ্যাসে অম্লধর্মী SO_2 গ্যাস থাকে। ঐ SO_2 গ্যাসকে $CaCO_3$ গুঁড়া বা CaO গুঁড়ার পানির মিশ্রণে শোষণ করে পরিবেশ দূষণ রোধ করার এ প্রকল্পকে Flue Gas Desulfurisation বা FGD প্লান্ট বলে।

* **ETP :** রাসায়নিক শিল্প কারখানার বর্জ্য পানিতে জৈব ও অজৈব পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এ বর্জ্য পানিকে effluent বলা হয়। এ ক্ষতিকর বর্জ্য পানি থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূষক পদার্থ পৃথক করার রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে effluent treatment plant বা ETP বলা হয়।

* **বিলেট (Billet) :** ধাতু নিষ্কাশন বা রিসাইক্লিং কালে গলিত ধাতুকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ করার জন্য নির্গম ট্যাপের সাহায্যে ঐ ধাতুকে সিলিন্ডার আকারে ঠাণ্ডা করা হয়। এরূপ আকারের কপার সিলিন্ডার রিসাইক্লিং কালে তৈরি করা হয়। এদেরকে কপার বিলেট বলে।

* **বায়োডিগ্রেডেবল (Biodegradable) :** যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ মাটিতে মাইক্রো অর্গানিজম বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পচনক্রিয়ার মাধ্যমে মাটিতে রূপান্তরিত হয়, এদেরকে বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থ বলে। যেমন সবজি ও জৈব পদার্থ। যে সমস্ত পদার্থ মাটিতে পচন ক্রিয়ায় মিশে যায় না, এদেরকে নন্‌বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থ বলে। যেমন– প্লাস্টিক সামগ্রী।

* **ন্যানো পার্টিকেল :** ন্যানোস্কেল মতে যেসব কণার দৈর্ঘ্য 1nm থেকে 100 nm এর মধ্যে থাকে, এদেরকে ন্যানো পার্টিকেল বলে।

* **ফুলারিনস :** কার্বন পরমাণু sp^2 সংকরিত অবস্থায় 30–70টি পরস্পর সমযোজী বন্ধনে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন আকৃতির গঠন তৈরি করে। কার্বনের এ রূপভেদসমূহকে ফুলারিনস বলে। C_{60} সংকেতের আণবিক গঠন স্থপতি বুকমিনস্টার ফুলার নির্মিত ভূগোলক আকৃতির গম্বুজের মতো, এটিকে বুকমিনস্টার ফুলারিন বা 'বাকি বল' বলে।

* **ন্যানো টিউব (Nano-tube) :** ন্যানো স্কেলে, একমাত্রিক বা রৈখিক বস্তুকণার পরিসর 1–100 nm হলে, একে ন্যানো লেয়ার বলে। এটি কার্বনের এক স্তরবিশিষ্ট ন্যানো-লেয়ার গ্রাফিন-এর টিউব আকার গঠন। এর প্রান্তে ফুলারিনের গোলকাকৃতির অর্ধেক অংশ যুক্ত থাকে। এটি দেখতে সাধারণ গ্লাস টিউবের মতো বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে। অনেকগুলো ন্যানো টিউব ছোট থেকে বড় পরস্পর এক কেন্দ্রিকভাবে বিন্যস্ত থাকে।

* **সেমিকন্ডাক্টর (Semiconductor) :** এ সব বস্তু বিদ্যুৎ পরিবাহী ও বিদ্যুৎ অপরিবাহীর মধ্যবর্তী গুণসম্পন্ন দুর্বল বিদ্যুৎ পরিবাহী। ন্যানো কণা দ্বারা সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করে ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়।